তিন গোয়েন্দা

ছুটি

রকিব হাসান

কিশোর থ্রিলার

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1274-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

সেবা প্রকাশনী

ঊনপঞ্চাশ টাকা

ছুটি

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৮৮

বড় ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলল কিশোর পাশা, 'হ্যাঁ, যা চাই সবই আছে। বিশাল প্রান্তর, জলাভূমি, পাহাড়, জঙ্গল, মাঝে মাঝে ছোট খামার, বাড়ি-ঘর। কয়েকটা সরাইখানাও আছে। কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব আমরা। রাফিয়ানের খুব মজা হবে।'

'ওর তো পোয়াবারো,' বলল পাশে বসা মুসা আমান। 'শুনেছি, অনেক খরগোশ আছে ওদিকে। হরিণও।'

খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে বাতাস আসছে, কোঁকড়া লম্বা চুল উড়ছে কিশোরের। বার বার এসে পড়ছে কপালে, চোখেমুখে, সরাতে হচ্ছে। মুসার সে ঝামেলা নেই, খাটো করে ছাঁটা চুল, খুলি কামড়ে রয়েছে যেন।

গাঁয়ের দিকে ছুটে চলেছে বাস।

'স্কুল পালিয়েছ বুঝি?' টিকিট বাড়িয়ে দিয়ে হাসল কণ্ডাকটার।

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন,' মাথা কাত করল মুসা। 'শহরের গ্যাঞ্জাম আর ভাল্লাগছিল না, স্কুলও ছুটি। পালিয়ে এসেছি।'

শেষ স্টপেজে থামল বাস। আর সামনে যাবে না। বাস বদলাতে হবে।

সামনের দরজা দিয়ে নামল কিশোর আর মুসা। পেছনের দরজা দিয়ে রবিন, জিনা আর রাফিয়ান।

বদলানো বাসের যাত্রাও শেষ হলো। কিশোরকে বলল কণ্ডাকটার, 'শেষ। এবার ফিরে যাব।...তা কোথায় যাবে তোমরা? টিংকার ভিলেজ?'

নামল পাঁচ অভিযাত্রী।

ছড়ানো সবুজ মাঠ, ছোট্ট পুকুরে হাঁস, মেঘের ছায়া।

আনন্দে পাগল হয়ে উঠল রাফিয়ান। চার বন্ধুকে ঘিরে নাচানাচি করছে, ছুটে গিয়ে এক দৌড়ে ফিরে আসছে আবার। লাফাচ্ছে। ঘেউ ঘেউ করছে হাঁসের দিকে চেয়ে। ঘ্যাঁত ঘ্যাঁত করে তাকে ধমক দিল মস্ত এক রাজহাঁস।

'খাবার-টাবার কিছু কিনে নেয়া দরকার,' বলল কিশোর।

একটা দোকান দেখিয়ে জিনা বলল, 'চলো না, গিয়ে দেখি, কি পাওয়া যায়।'

'আরে, আরে!' ভেতরের আরেকটা ঘর থেকে দরজায় বেরিয়ে এসেছেন এক মহিলা, দোকানের মালিক, 'কুত্তাটাকে ঢুকিয়েছ কেন? আরে কেমন লাফাচ্ছে। পাগলা নাকি? বের করো, বের করো।'

'না না, পাগল না,' হেসে বলল জিনা। 'বেশি খুশি। খাওয়ার গন্ধ পেয়েছে তো।'

'অ। তাই বলো। তা কিছু মনে কোরো না। খাবারের দোকান, পরিষ্কার

রাখি। ওটাকে বাইরে রেখে এসো, প্লীজ।'

'এই রাফি, আয়,' কুকুরটার গলার বেল্ট ধরে টেনে নিয়ে চলল কিশোর। 'তুই বাইরেই থাক। আমরাই আনতে পারব সব।'

কাউন্টারের পেছনে একটা তাক দেখিয়ে বলল মুসা, 'বাহ্, দারুণ তো দেখতে। টেস্টও খুব ভাল হবে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ভাল,' বললেন মহিলা। 'আমি বানিয়েছি। আমার ছেলে স্যাণ্ডউইচ খুব পছন্দ করে। এই তো, আসার সময় হয়ে এল তার। গ্রীন ফার্মে কাজ করে।'

'আমাদের কয়েকটা বানিয়ে দিতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'চিনি না জানি না, কোথায় আবার কোন গাঁয়ে গিয়ে খুঁজব। লাঞ্চের ব্যবস্থা সঙ্গেই নিয়ে যেতে চাই।'

'হ্যাঁ, তা পারব। কি কি নেবে? পনির, ডিম, শুয়োর, গরু?'

'শুয়োর বাদে আর সবই দিন। চারটে কোক দেবেন?'

'নাও না, নিয়ে খাও,' বললেন মহিলা। 'ওই যে গেলাস।'

'আচ্ছা। আর হ্যাঁ, ভাল পাঁউরুটিও দেবেন।'

'খারাপ জিনিস আমি বানাই না। তোমরা কোক খাও। কেউ এলে ডেকো।' ভেতরের ঘরে চলে গেলেন আবার মহিলা।

'ভালই হলো,' বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল কিশোর। 'খাওয়ার ভাবনা না থাকলে নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারব। আজ একদিনেই অনেক জায়গা দেখা হয়ে যাবে।'

'কতগুলো লাগবে?' হঠাৎ দরজায় দেখা দিলেন মহিলা। 'আমার ছেলে এক বেলায়ই ছটা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে ফেলে। বারো টুকরো রুটি লাগে বানাতে।

'অ্যাঁ···আমাদের একেকজনের জন্যে আটটা করে বানান,' মহিলার চোখ বড় বড় করে দিল কিশোর। 'পাঁচ-আটে চল্লিশটা। সারা দিন চলে যাবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন মহিলা।

'ভারি কাজ দিয়ে ফেলেছি,' সহানুভূতির সুরে বলল রবিন। মাকে বেশি খাটতে দেখলে কষ্ট লাগে তার, নিজেও গিয়ে সাহায্য করে। 'আটটা স্যাণ্ডউইচ তারমানে ষোলোটা করে রুটির টুকরো, পাঁচ-ষোলো আশি···নাহ্, ভাবতেই খারাপ লাগছে,' রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকতে ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু মহিলা আবার কিছু মনে করে বসেন ভেবে গেল না।

'আরে অত ভেব না,' প্রথমে এক চুমুকে আধ গেলাস কোকাকোলা খালি করেছে মুসা, আরেক চুমুকে বাকিটা শেষ করে ঠকাস করে গেলাস নামিয়ে রাখল টেবিলে। 'দেখো, কে আসছে।'

দরজার বাইরে সাইকেল থেকে নামল লম্বা এক লোক, হ্যাণ্ডেল ধরে রেখেই ডাকল, 'মা?'

কে লোকটা, চিনিয়ে দিতে হলো না। ওরা বুঝল, মহিলার ছেলে, যে গ্রীন ফার্মে কাজ করে। খেতে এসেছে।

'আপনার মা ভেতরে,' বলল মুসা। 'ডাকব?'

'থাক।' সাইকেল রেখে ভেতরে ঢুকল লোকটা, তাক থেকে স্যাণ্ডউইচগুলো

একটা প্যাকেটে নিয়ে আবার রওনা দিল। দরজার কাছে গিয়ে চেয়ে বলল, 'মাকে বোলো, আমি নিয়ে গেছি। তাড়াহুড়ো আছে। ফিরতেও দেরি হবে। কিছু জিনিস নিয়ে যেতে হবে জেলে।'

জোরে জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে চলে গেল লোকটা।

হঠাৎ দরজায় উদয় হলেন আবার মহিলা, হাতে ইয়া বড় এক রুটি কাটার ছুরি। আরেক হাতে রুটি। 'ডিকের গলা শুনলাম···ও-মা, স্যাণ্ডউইচও নিয়ে গেছে। ডাকোনি কেন?'

'তাড়াহুড়ো আছে বলল,' জানাল কিশোর। 'ফিরতেও নাকি দেরি হবে আজ। কি নাকি নিয়ে যেতে হবে জেলে।'

'আমার আরেক ছেলে আছে জেলখানায়।'

মহিলার কথায় এক সঙ্গে তার দিকে ঘুরে গেল চার জোড়া চোখ। জেলখানায়? কয়েদী? কোন্ জেলে?

ওদের মনের কথা বুঝে হাসলেন মহিলা। 'না না, রিক কয়েদী নয়। ওয়ারডার। খুব ভাল ছেলে আমার। ওর চাকরিটা আমার মোটেই ভাল্লাগে না। চোর-ডাকাতের সঙ্গে বাস, কখন কি হয়!'

'হ্যাঁ, ম্যাপে দেখলাম,' বলল কিশোর। 'বড় একটা জেলখানা আছে এদিকে। আমরা ওটার ধারে-কাছেও যাব না।'

'না, যেয়ো না,' মহিলাও হুঁশিয়ার করলেন, ঢুকে গেলেন ভেতরে।

দাঁড়িয়ে আছে ছেলেরা। অনেকক্ষণ। মাত্র একজন খরিদ্দারের দেখা পেল। বিষণ্ণ চেহারার এক বৃদ্ধ, পাইপ টানতে টানতে ঢুকল। দোকানের চারদিকে তাকিয়ে মহিলাকে খুঁজল। তারপর এক প্যাকেট পাউডার নিয়ে পকেটে ঢোকাল। কিশোর লক্ষ করল, পাউডারটা পাঁচড়ার ওষুধ।

পকেট থেকে পয়সা বের করে কাউন্টারে ফেলল লোকটা। পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেই বলল, 'মহিলাকে বোলো, নিয়ে গেলাম,' বেরিয়ে গেল সে।

লোকটার গায়ে-কাপড়ে দুর্গন্ধ, কদিন গোসল করে না, কাপড় ধোয় না কে জানে। বুড়োর ভাবভঙ্গি আর গন্ধ কোনটাই পছন্দ হলো না রাফিয়ানের, চাপা গোঁ গোঁ করে উঠল।

অবশেষে স্যাণ্ডউইচ তৈরি শেষ হলো। বেরিয়ে এলেন মহিলা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সুন্দর করে প্যাকেট করে দিলেন সব খাবার, প্রতিটি প্যাকেটের ওপর পেনসিল দিয়ে লিখে দিলেন কোনটাতে কি আছে। পড়ে, অন্যদের দিকে চেয়ে চোখ টিপল মুসা, ঝকঝকে সাদা দাঁত আর একটাও লুকিয়ে নেই, বেরিয়ে পড়েছে হাসিতে। 'খাইছে! আল্লাহরে, নিশ্চয় কোন পুণ্য করে ফেলেছিলাম। এত খাবার?··· আরে, ওটাতে কি?'

'ফ্রুট কেক,' হেসে বললেন মহিলা। 'বেশি নেই, চার টুকরো ছিল। দিয়ে দিলাম। ফাউ। পয়সা লাগবে না। খেয়ে ভাল লাগলে ফেরার পথে জানিয়ে যেয়ো।'

অনেক চাপাচাপি করেও কেকগুলোর জন্যে পয়সা দিতে পারল না কিশোর। কাউন্টারের দিকে চোখ পড়তেই বললেন, 'পয়সা এল কোত্থেকে?'

বলল কিশোর।

'ও, রিকেট বুড়ো,' মাথা দোলালেন মহিলা। 'ঠিক আছে, তোমাদের যাত্রা শুভ হোক। ফেরার পথে দেখা করে যেয়ো। আর, খাবারের দরকার পড়লেই চলে এসো এখানে।'

'ঘাউ!' মহিলার কথা বুঝেই যেন সায় জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল রাফিয়ান, দরজার বাইরে থেকে।

'ও, তুই। ভুলেই গিয়েছিলাম।' রান্নাঘর থেকে বেশ বড় এক টুকরো হাড় এনে ছুঁড়ে দিলেন কুকুরটার দিকে।

মাটিতে আর পড়তে পারল না। শূন্যেই লুফে নিল রাফিয়ান।

মহিলাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

দুই

আহ, ছুটির কি আনন্দ! অনেক পেছনে ফেলে এসেছে স্কুল। অক্টোবরের রোদে উষ্ণ আমেজ। শরতের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে প্রকৃতি, গাছে গাছে হলুদ, লাল, সোনালি রঙের সমারোহ। রোদে যেন জ্বলছে। জোরে বাতাস লাগলে বোঁটা থেকে খসে যাচ্ছে মরা পাতা, ঢেউয়ে নৌকা যেমন দোলে, তেমনি দুলতে দুলতে নামছে মাটিতে।

ছোট্ট যে গাঁয়ে বাস থেকে নেমেছিল ওরা, সেটা পেছনে ফেলে এল। খুব ভাল লাগছে হাঁটতে। আঁকাবাঁকা সরু পথে নেমেছে এখন। দু-ধারে পাতাবাহারের ঝাড় এত ঘন হয়ে জন্মেছে, আর এত উঁচু, ওপর দিয়ে দেখা যায় না ওপাশে কি আছে। মাথার ওপরে ডালপাতা দু-পাশ থেকে এসে গায়ে গায়ে লেগে চাঁদোয়া তৈরি করে দিয়েছে, তার ফাঁক-ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে আসছে যেন আলো।

'এ-তো দেখি একেবারে সুড়ঙ্গ,' বলল মুসা। 'নাম কি জায়গাটার?'

'এটার নাম কি ঠিক বলতে পারছি না,' বলল কিশোর। 'তবে এটা হরিণ পাহাড়ে চলে গেছে।'

'হরিণ পাহাড়?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।

'ডিয়ার হিল। বাংলা করলে হরিণ পাহাড়ই দাঁড়ায়, নাকি?'

'হ্যাঁ, তা হয়,' তার বাংলা শব্দের সীমিত ভাণ্ডার খুঁজল রবিন। 'শুনতেও ভাল লাগছে।'

'এখানের নামগুলোই সুন্দর। অন্ধ উপত্যকা, হরিণ পাহাড়, কুয়াশা হ্রদ, হলুদ দীঘি, ঘুঘুমারি...'

'ওফ্, দারুণ তো!' বলে উঠল জিনা। 'অরিজিনাল নামগুলো কি?'

'ব্লাইণ্ড ভ্যালি, ডিয়ার হিল, মিসটি লেক, ইয়েলো পণ্ড, ডাভ ডেথ...'

'অপূর্ব!' বলল রবিন। 'বাংলা ইংরেজি দুটোই।'

'বাংলাটাই থাক না তাহলে?' দ্বিধা করছে কিশোর, যার যার মাতৃভাষা তার কাছে প্রিয়, বন্ধুরা আবার কি মনে করে। 'বাইরের কারও সঙ্গে বলার সময়

ইংরেজিই বলতে হবে, আমরা নিজেরা নিজেরা…'

'আমি রাজি। আমার কাছে বাংলাই ভাল লাগছে,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা। 'নিজের ভাষা কিছু কিছু জানি, কিন্তু সেটা না জানারই শামিল, বাংলার চেয়েও কম জানি। সেই কবে কোন কালে আফ্রিকা ছেড়ে চলে এসেছিল আমার দাদার দাদা…ভুল বললাম, চলে আসেনি, জোর করে ধরে আনা হয়েছিল, গোলাম করে রাখার জন্যে…শ্বেতাঙ্গরা…'

আড়চোখে জিনার দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলল কিশোর, 'থাক থাক, পুরানো ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটির দরকার নেই, ঝগড়া লেগে যাবে এখন। ছুটির আনন্দই মাটি হবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম…'

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে ওরা।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল রাফিয়ান। খরগোশের গন্ধ পেয়েছে।

'আরিব্বাপরে!' জিন অবাক। 'এত্তো খরগোশ! এই দিনের বেলায়? আমার গোবেল দ্বীপেও তো এত নেই।'

হরিণ পাহাড়ে এসে উঠল ওরা। বসল, খরগোশ দেখার জন্যে। রাফিয়ানকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল, কিছুতেই আটকে রাখা যাচ্ছে না। খরগোশের গন্ধে পাগল হয়ে গেছে যেন সে। এক ঝাড়া দিয়ে জিনার হাত থেকে বেল্ট ছুটিয়ে নিয়েই দিল দৌড়।

'রাফি! রাফি !' চেঁচিয়ে উঠল জিনা।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? রাফিয়ানের কানেই ঢুকল না যেন ডাক, তার এক চিন্তা, খরগোশ ধরবে।

এত বোকা নয় খরগোশেরা যে চুপচাপ বসে থেকে কুকুরের খপ্পরে পড়বে। সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল গর্তে। ভোজবাজির মত, এই ছিল এই নেই।

অনেক চেষ্টা করেও একটা খরগোশ ধরতে পারল না রাফিয়ান। তার কাণ্ড দেখে হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল মুসা আর জিনা।

অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল ব্যর্থ রাফিয়ান, জিভ আধহাত বেরিয়ে পড়েছে।

'ভুল নাম রেখেছে,' বলল রবিন। 'নাম রাখা উচিত ছিল আসলে খরগোশ পাহাড়। চলো, উঠি।'

চূড়া পেরিয়ে পাহাড়ের উল্টোদিকের ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ওরা। এদিকে খরগোশ যেন আরও বেশি। রাফিয়ান বোধহয় ভাবল, অন্যপাশের চেয়ে এপাশের ওরা বোকা, তাই আবার তাড়া করল।

সেই একই কাণ্ড। সুড়ুৎ।

রেগে গেল রাফিয়ান। গর্তে ঢোকা? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। বড় একটা খরগোশকে বাইরে দেখে তাড়া করল। খরগোশটাও সেয়ানা। এঁকেবেঁকে এপাশে ওপাশে লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বড় একটা গর্তের ভেতর।

কোন রকম ভাবনাচিন্তা না করেই মাথা ঢুকিয়ে দিল রাফিয়ান, ঢুকে গেল গর্তে। তারপরই পড়ল বিপদে। আটকে গেল শরীর। না পারছে ঢুকতে, না বেরোতে।

অসহায় ভাবে পেছনের পা ছুঁড়তে লাগল শুধু।

'আরে!' দৌড় দিল জিনা। 'এই রাফি, রাফি, বেরিয়ে আয়। আয় জলদি।'

বেরোতে পারলে তো বাঁচে এখন রাফিয়ান, জিনার ডাকের কি আর অপেক্ষা করে? কিন্তু পারছে তো না। পেছনের পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়ে ধুলোর ঝড় তুলেছে, বেরোনোর চেষ্টায়।

পুরো বিশ মিনিট লাগল রাফিয়ানকে বের করে আনতে। প্রথমেই গর্তে ঢোকার চেষ্টা করল মুসা। তার বিরাট শরীর ঢুকল না। কিশোর আর জিনাও ঢুকতে পারল না। রোগা-পটকা ক্ষীণ দেহ একমাত্র রবিনের, তাকেই মাথা ঢোকাতে হলো অবশেষে।

রাফিয়ানের পেছনের পা ধরে টানতে লাগল রবিন, তার অর্ধেক শরীর গুহার বাইরে, অর্ধেক ভেতরে। কুকুরটার কাঁধের পেছন দিক আটকে গেছে একটা মোটা শেকড়ে, টেনেও বের করা যাচ্ছে না। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল।

'আহ্, এত জোরে টেনো না,' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'ব্যথা পাচ্ছে তো।'

'জোরে টেনেও তো বের করতে পারছি না,' গর্তের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে জবাব দিল রবিন। 'জোর পাচ্ছি না। আমার পা ধরে টানো।

অনেক টানা-হেঁচড়ার পর বের করা গেল অবশেষে। বিধ্বস্ত চেহারা, কুঁইকুঁই করে গিয়ে জিনার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল রাফিয়ান। খুব ভয় পেয়েছে বেচারা।

'সাংঘাতিক ব্যথা পেয়েছে কোথাও,' কুকুরটার সারা গা টিপেটুপে দেখতে শুরু করল জিনা। চারটে পা-ই টেনে টেনে দেখল। ভাঙেনি। জখমও দেখা যাচ্ছে না। 'ব্যথা পেয়েছেই। নইলে এমন কোঁ কোঁ করত না। কিন্তু লাগল কোথায়?'

'ভয়ে অমন করছে,' কিশোর বলল। 'জখম থাকলে তো দেখতামই। পা-ও ভাঙেনি।'

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না জিনা। 'পশু ডাক্তারকে দেখালে হয় না?'

'এখানে পশু ডাক্তার পাবে কোথায়? খামোকা ভাবছ। রাফিয়ান ঠিকই আছে। চলো, হাঁটি।'

ঘুঘুমারিও পেরিয়ে এল ওরা। আলাপ-আলোচনা আর হাসিঠাট্টা তেমন জমছে না। গুম হয়ে আছে জিনা। বার বার তাকাচ্ছে পাশে রাফিয়ানের দিকে। কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

ব্যথা পেয়েছে, এমন কোন ভাব দেখাচ্ছে না রাফিয়ান, ঠিকমতই হাঁটছে, মাঝে মাঝে গুঙিয়ে উঠছে শুধু।

'এখানেই লাঞ্চ সারা যাক, কি বলো?' আরেকটা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ, তা যায়,' মাথা কাত করল মুসা। 'নাম কি এটার?'

'ম্যাপে কোন নাম নেই। তবে আমি রাখতে পারি···ঢালু পাহাড়? খুব মানাবে। দেখেছ, কেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে অনেক দূর···' স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে কিশোরের অপূর্ব সুন্দর দুই চোখ।

ভাল লাগার মতই দৃশ্য। মাইলের পর মাইল একটানা ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল

নিঃসঙ্গ প্রান্তর, ঘন সবুজ ঘাস চকচক করছে রোদে। তাতে চরছে লাজুক হরিণ আর উদ্দাম ছোট ছোট বুনো ঘোড়া। যেন পটে আঁকা ছবি।

বসে পড়ল ওরা ঘাসের গুচ্ছের নরম কার্পেটে।

'অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি, ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি,' দিগন্তের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করল কিশোর, মন চলে গেছে তার হাজার হাজার মাইল দূরের আরেক স্বপ্নরাজ্যে, তার স্বপ্নের বাংলাদেশে। সেই দেশটাও কি এত সুন্দর, ভাবল সে, কবিতা পড়ে তো মনে হয় এর চেয়েও সুন্দর।

'দেশটা সত্যি ভারি সুন্দর,' কিশোরের মতই দূরে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। এই সবুজ একদিন ঢেকে যাবে ধবধবে সাদা বরফে, তুষার ঝরবে পেঁজা তুলোর মত, আকাশের মুখ অন্ধকার, মেরু থেকে ধেয়ে আসবে হাড় কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডা…'

'ওদিকে স্যাণ্ডউইচগুলো তো কাঁদতে শুরু করেছে, খাচ্ছি না বলে,' বেরসিকের মত বাধা দিল মুসা। 'কাব্যচর্চা রেখে আগে পেটচর্চা সেরে নাও। আরে এই জিনা, এত গম্ভীর হয়ে আছো কেন? তোমার মুখ কালো দেখলে তো আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে…'

অন্য সময় হলে কথার-করাত চালাত জিনা, এখন শুধু মাথা নাড়ল। 'রাফি…'

'দূর, তুমি খামোকা ভাবছ। কিচ্ছু হয়নি। দেখো, একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। পেটে বোধহয় খিদে…দেখছ না আমার কেমন খারাপ লাগছে? ওরও বোধহয় তেমনি…'

মুসার কথায় হেসে ফেলল জিনা। অন্যদের মুখেও হাসি ফুটল।

'হুঁ,' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা, 'দারুণ হয়েছে। ডিকের মায়ের হাতে যাদু আছে। নে, রাফি, এই কাবাবটা চেখে দেখ।'

কাবাব চিবাতে চিবাতে আস্তে মাথা নাড়ল রাফিয়ান, গোঁ করে উঠল। ব্যথায়, না কেন, সে-ই জানে। কিন্তু এটাকেই সম্মতি ধরে নিয়ে মুসা হাসল, 'কি, বলেছি না ভাল?'

সবার চেয়ে অনেক বেশিই খেলো রাফিয়ান, তবে চুপচাপ রয়েছে। এই ব্যাপারটাই ভাল লাগছে না জিনার।

একেক জনের ভাগে তিনটে করে স্যাণ্ডউইচ বাঁচল। আর অর্ধেক টুকরো করে কেক। বাকি সব সাবাড় করে ফেলেছে।

'ডিকের চেয়ে কম কি আমরা?' ভুরু নাচাল মুসা। 'ও ছ-টা খায়, আমরা পাঁচটা…'

'তুমি সাতটা খেয়েছ,' শুধরে দিল রবিন। 'নিজেদেরগুলো সেরেও আমাদের ভাগ থেকে মেরেছ তুমি আর রাফি…'

'ঘউ,' করে স্বীকার করল যেন রাফিয়ান। কেকের টুকরোর দিকে চেয়ে লেজ নাড়ছে। জিভে লালা। তাকে কেক দেয়া হয়নি।

'বলেছিলাম না, খেলেই ভাল হয়ে যাবে রাক্ষসটা,' হেসে বলল মুসা। 'নে খা, তুই আমার কাছ থেকেই নে…' খানিকটা কেক ভেঙে কুকুরটার মুখের কাছে

ফেলল।

এক চিবান দিয়েই কোঁত করে গিলে ফেলল রাফিয়ান। করুণ চোখে তাকাল মুসার হাতের বাকি কেকটুকুর দিকে।

তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল মুসা। 'না বাবা, আর দিচ্ছি না। রাতে খেতে হবে আমার। তুমি বাপু যত পাও ততই চাও…'

হাসল সবাই। কেটে গেল নিরানন্দ ভাবটা।

'চলো, ওঠা যাক,' বলল কিশোর। 'পাঁচটার আগেই ফার্মটায় পৌঁছতে হবে। এখানে আবার তাড়াতাড়ি রাত নামে।'

'কোন ফার্ম?' জানতে চাইল রবিন।

'হলুদ দীঘি।'

'যদি থাকার জায়গা না থাকে?'

'জিনাকে একটা ঘর দিতে পারলেই হলো। আমরা গোলাঘরে খড়ের গাদায়ই ঘুমোতে পারব।'

'কেন, আমি পারব না কেন?' গলা লম্বা করে ঝাঁকি দিল জিনা।

'কারণ, তুমি মেয়ে। ছেলের পোশাক পরে আছো বটে, কিন্তু মেয়ে তো।'

'দেখো, মেয়ে মেয়ে করবে না। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কম কিসে?'

'তাহলে ছেলে সেজে থাকো কেন?' ফস করে বলে বসল মুসা।

'থাকি, থাকি, আমার খুশি,' রেগে উঠল জিনা। 'তোমার কি?'

'এই তো রেগে গেল,' বিরক্ত হয়ে উঠল কিশোর। 'তোমাদের জ্বালায় বাপু শান্তিতে পরামর্শ করারও জো নেই। জিনা, খামাকো জেদ করছ। তুমি মেয়ে, কিছু অসুবিধে তোমার আছে, ছেলেদের যা নেই। এটা কি অস্বীকার করতে পারবে?'

চুপ করে রইল জিনা। মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। তবে আর তর্ক করল না। আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল।

মালপত্রের বোঝা পিঠে তুলে নিয়ে আবার রওনা হলো ওরা। রাফিয়ান শান্ত। লাফঝাঁপ সব যেন ভুলে গেছে, জোরে হাঁটার চেষ্টাও করছে না। পা ফেলছে অতি সাবধানে, মেপে মেপে।

ব্যাপারটা জিনার চোখ এড়াল না। 'কি হয়েছে রাফি? খারাপ লাগছে?'

জবাবে শুধু কাঁউ করল কুকুটা।

আরও খানিক দূর যাওয়ার পর খোঁড়াতে শুরু করল রাফিয়ান। পেছনের বাঁ পা ঠিকমত ফেলতে পারছে না।

থামল সবাই।

বসে পড়ে পা-টা ভালমত দেখল জিনা। 'মনে হয় মচকেছে,' রাফিয়ানের পিঠে হাত বোলাল সে।

মৃদু গাঁউক করে উঠল রাফিয়ান।

যেখানে হাত লাগলে ব্যথা পায় কুকুরটা, সে জায়গার রোম সরিয়ে দেখল জিনা। 'আরে, যখম! রক্ত জমেছে, ফুলেছেও। ওইটানাটানির সময়ই লেগেছিল।'

'দেখি তো,' বসে পড়ে কিশোরও দেখল। 'না, বেশি না। সামান্য। রাতে

ঘুমোলেই সেরে যাবে।'

'কিন্তু শিওর হওয়া দরকার,' খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে জিনাকে। 'কিশোর, গ্রাম আর কদ্দুর?'

'এই সামনেই। র‍্যাংকিন ভিলেজ। গাঁয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করব, পশু ডাক্তার কোথায় পাওয়া যাবে।'

'জলদি চলো। ইস্, কেন যে এত বড় হলো কুকুরটা, নইলে কোলে করেই নিতে পারতাম। হাঁটতেই পারছে না বেচারা।'

'যা পারে হাঁটুক এখন,' বলল মুসা। 'একেবারে না পারলে তো বয়ে নিতেই হবে। সে তখন দেখা যাবে।'

খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে রাফিয়ান। বেশি খোঁড়াচ্ছে। শেষে আর পা-ই ফেলতে পারল না। মচকানো পা-টা তুলে তিন পায়ে লাফিয়ে এগোল।

'ইস্, কি কষ্ট বেচারার...' কেঁদে ফেলবে যেন জিনা।

র‍্যাংকিন ভিলেজে এসে ঢুকল বিষণ্ণ দলটা। গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে একটা সরাইখানা, নাম র‍্যাংকিন রেস্ট।

ঝাড়ন দিয়ে জানালার কাচের ধুলো ঝাড়ছে এক মহিলা।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ম্যাডাম। কাছাকাছি পশু ডাক্তার কোথায় আছে?'

রাফিয়ানের দিকে তাকাল মহিলা। 'কাছাকাছি বলতে তো ছ-মাইল দূরে, ডারবিনে।'

শুকিয়ে, এতটুকু হয়ে গেল জিনার মুখ। ছয় মাইল! কিছুতেই হেঁটে যেতে পারবে না রাফিয়ান।

'বাস-টাস কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'না,' বলল মহিলা। 'তবে মিস্টার নরিসকে বলে দেখতে পারো। তার ঘোড়ার গাড়ি আছে। কুকুরটার পা বেশি খারাপ?'

'হ্যাঁ। ম্যাডাম, তাঁর বাড়ি কত দূর?'

'এই আধ মাইল। ওই যে পাহাড়টা, ওখান থেকে ডানে চাইলেই বাড়িটা দেখতে পাবে। বড় বাড়ি। দেখলেই চিনবে। চারপাশে আস্তাবল, ঘোড়া পালে মিস্টার নরিস। খুব ভাল মানুষ। যদি বাড়িতে না পাও, বোসো কিছুক্ষণ। রাতে বাইরে থাকে না, যেখানেই যাক ফিরে আসবে।'

দ্রুত পরামর্শ করে নিল চারজনে। কিশোর বলল, 'মিস্টার নরিসের কাছেই যেতে হবে বোঝা যাচ্ছে। তবে সবার যাওয়ার দরকার নেই। মুসা, রবিনকে নিয়ে তুমি হলুদ দীঘিতে চলে যাও। রাতে থাকার ব্যবস্থা করে রাখোগে। আমি জিনার সঙ্গে যাচ্ছি। ফিরতে কত রাত হয় কে জানে।'

'ঠিক আছে,' বলল মুসা। 'টর্চ আছে তো তোমার কাছে? গাঁয়ে তো রাস্তায় বাতি নেই, রাতে খুব অন্ধকার হবে।'

'আছে,' জানাল কিশোর।

'চলো, কিশোর,' তাড়া দিল জিনা। রবিন আর মুসার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে

বলল, 'রাতে দেখা হবে।'

জিনা আর কিশোর পাহাড়ের দিকে রওনা হলো। পাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে রাফিয়ান।

সেদিকে চেয়ে আনমনে বলল মুসা, 'ভাল হয়ে গেলেই বাঁচি। নইলে ছুটিটাই মাটি হবে।'

ঘুরে আরেক দিকে রওনা হলো সে আর রবিন।

নির্জন পথ।

এক জায়গায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা হলো। টমটম চালিয়ে আসছে। বিষণ্ণ চেহারা, মাথাটা অনেকটা বুলেটের মত।

ডাকল মুসা।

ঘোড়ার রাশ টেনে থামাল লোকটা।

'এ-রাস্তা কি ইয়েলো পণ্ডে গেছে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'আ,' মাথা নুইয়ে বলল লোকটা।

'সোজা? নাকি ডানে বাঁয়ে আর কোন গলি আছে?'

'আ,' আবার মাথা নোয়াল লোকটা।

'এটাই পথ তো? মানে ওদিকে যেতে হবে?' গলা চড়িয়ে হাত নেড়ে দেখাল মুসা।

'আ,' বলে চাবুক তুলে পেছন দিক দেখাল লোকটা, তারপর পশ্চিমে দেখাল।

'ডানে ঘুরতে হবে?'

'আ,' মাথা নোয়াল লোকটা। হঠাৎ খোঁচা মারল ঘোড়ার পেটে। লাফিয়ে সামনে বাড়ল ঘোড়া, আরেকটু হলেই দিয়েছিল মুসার পা মাড়িয়ে।

'খালি তো আ আ করল,' মুসার মতই রবিনও অবাক হয়েছে লোকটার অদ্ভুত ব্যবহারে। 'কি বোঝাল সে-ই জানে।'

তিন

হঠাৎ করেই নামল রাত। সূর্য ডোবার পর অন্ধকার আর সময়ই দেয়নি সাঁঝকে। কাল মেঘ জমেছে আকাশে।

'কি কাণ্ড দেখো,' গম্ভীর হয়ে বলল মুসা। 'দিনটা কি ভাল গেল। বোঝাই যায়নি বৃষ্টি আসবে।'

'তাড়াতাড়ি চলো,' বলল রবিন। 'ভিজে চুপচুপে হয়ে যাব। মাথা বাঁচানোরও জায়গা নেই।'

মোড় নিয়ে কয়েক কদম এগিয়েই থমকে গেল দুজনে। খুব সরু পথ, পাতাবাহারের ঝোপের সুড়ঙ্গ। সকালে এমন একটা পথে হেঁটে এসেছে। দিনের বেলায়ই আবছা অন্ধকার ছিল ওটাতে। এটাতে এখন গাঢ় অন্ধকার।

'ঠিক পথেই যাচ্ছি তো?' মুসার কণ্ঠে সন্দেহ।

'কি জানি।' রবিনও বুঝতে পারছে না।

'যা থাকে কপালে, ভেবে রবিনের হাত ধরে হাঁটতে শুরু করল মুসা। কয়বার মোড় নিয়েছে পথ, কতখানি এঁকেবেঁকে গেছে, কিছুই বোঝা গেল না। অন্ধের মত এগিয়ে চলেছে দুজনে। জুতোর তলায় ছপছপ করছে কাদা-পানি।

'নর্দমায় নামলাম না তো?' মুসা বলল। 'জুতোর ভেতর পানি ঢুকছে।'

'আমারও সুবিধে লাগছে না, মুসা। যতই এগোচ্ছি, পানি কিন্তু বাড়ছে। শেষে গিয়ে কুয়া-টুয়ায় না পড়ে মরি।'

'টর্চটা কোথায় রাখলাম?' ব্যাগের ভেতরে খুঁজছে মুসা। 'ফেলে এলাম, না কি? রবিন, তোমারটা বের করো তো।'

টর্চ বের করে দিল রবিন।

জ্বালল মুসা। আলোর চারপাশ ঘিরে যেন আরও ঘন হলো অন্ধকার। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল সে। সামনে একটু দূরে, এক জায়গায় কাঠের বেড়া শুরু হয়েছে রাস্তার এক পাশ থেকে, ওখানে খানিকটা জায়গায় পাতাবাহার নেই, কেটে সাফ করা হয়েছে বোধহয়। পথটা সরু খালের মত, দু-ধারে উঁচু পাড়।

'বেড়াটা নিশ্চয় কোন ফার্মে গিয়ে শেষ হয়েছে,' বলল মুসা। 'আস্তাবল কিংবা গরুর খোঁয়াড় পেলেও মাথা বাঁচাতে পারি, ভিজতে হবে না। চলো, দেখি।'

পাড়ে উঠে বেড়া ধরে ধরে এগোল ওরা। ফসলের খেতের মাঝখান দিয়ে সরু পথ।

'মনে হচ্ছে এটা শর্টকাট,' আন্দাজ করল মুসা। 'ফার্ম হাউসটা বোধহয় আর বেশি দূরে না।'

একটা দুটো করে ফোঁটা পড়তে শুরু করল, যে কোন মুহূর্তে ঝুপঝুপ করে নামবে বৃষ্টি।

মুসার কথায় আশ্বস্ত হতে পারল না রবিন। সত্যিই পাবে তো ফার্মটা?'

জোরে নামল বৃষ্টি। বর্ষাতি বের করা দরকার। দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল ওরা। কোথায় ঢুকে বের করা যায়? ব্যাগের মধ্যে পানি ঢুকলে সব ভিজে যাবে, দুর্ভোগ পোহাতে হবে তখন।

মাঠের মধ্যেই দুটো আলের মিলনস্থলে ঘন একটা পাতাবাহারের ঝোপ চোখে পড়ল। দৌড়ে এসে তার ভেতরে ঢুকল দুজনে। ব্যাগ খুলে বর্ষাতি বের করল।

বৃষ্টি নামায় আরও ঘন হলো অন্ধকার। টর্চের আলো বেশি দূর যাচ্ছে না।

'আলো তো দেখছি না,' বলল রবিন। 'কই ফার্মটা?'

'কি জানি। বুঝতে পারছি না। ফিরে গিয়ে আবার সুড়ঙ্গে নামব? নাহ্, তা-ও বোধহয় ঠিক হবে না।'

'পথ যখন রয়েছে, নিশ্চয় কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু কোথায়?'

না বুঝে আর এগোনোর কোন মানে হয় না। দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে ভাবছে ওরা, কোন দিকে যাবে? কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন।

হঠাৎ করে এমনভাবে শুরু হলো শব্দটা, চমকে উঠল দুজনে। একে অন্যের হাত চেপে ধরল। নির্জন মাঠে, অন্ধকার রাতে এই দুর্যোগের মাঝে অদ্ভুত

শোনাচ্ছে।

ঘণ্টার শব্দ।

বেজেই চলেছে। প্রলয়ের সঙ্কেত যেন। অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল দুই কিশোরের।

'কোথায় বাজছে? এভাবে?' ফিসফিস করল রবিন, জোরে বলার সাহস নেই।

কোথায় বাজছে মুসা জানবে কি করে? সে-ও রবিনের মতই চমকে গেছে। কাছাকাছি নয়, দূরে কোথাও বাজছে। কখনও জোরে, কখনও আস্তে। এলোমেলো বাতাস বইছে, একবার এদিক থেকে, একবার ওদিক। বাতাস সরে গেলে শব্দও কমে যাচ্ছে, যে-ই বাড়ছে, অমনি যেন তাদেরকে ঘিরে ধরছে বিচিত্র ঘণ্টা-ধ্বনি।

'ইস্, থামে না কেন?' দুরুদুরু করছে মুসার বুক। 'গির্জার ঘণ্টা নয়।'

'না, তা-তো নয়ই,' কেঁপে উঠল রবিনের গলা। 'কোন ধরনের সঙ্কেত হতে পারে···আমি শিওর না।' অস্বস্তিতে হাত নাড়ল সে। বিড়বিড় করল, 'যুদ্ধ?···বীকন কই?'

'কি বিড়বিড় করছ?'

'অ্যাঁ?···বীকন। পুরানো আমলে যুদ্ধ লাগলে ওভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে হুঁশিয়ার করা হত গাঁয়ের লোককে। সেই সঙ্গে আলোর সঙ্কেত—বীকন বলা হত।'

'এখন তো পুরানো আমল নয়···' চমকে থেমে গেল মুসা।

রবিনের কথার মানে বুঝে ফেলেছে। 'কি বলতে চাইছ ?'

'বুঝেছ তুমিও। এখন পুরানো আমল নয়, তাহলে অন্ধকারে ঝড়-বৃষ্টির মাঝে ওই ঘণ্টা···'

'চুপ চুপ ! আর বোলো না,' ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল মুসা। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ল না। টর্চের রশ্মির সামনে শুধু অগুনতি বৃষ্টির ফোঁটা।

যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল শব্দ।

এরপরও কান পেতে রইল দুজনে। কিন্তু আর শোনা গেল না।

'চলো, হাঁটি,' বলল মুসা। 'ফার্মটা খুঁজে বের করা দরকার। আবার কখন শুরু হয়ে যায়···'

বেড়ার ধার ধরে আবার এগিয়ে চলল ওরা।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'ওই যে।'

মুসাও দেখল। আলো। না, বীকন নয়, জ্বলছে-নিভছে না। একভাবে জ্বলছে টিমটিম করে।

'পাওয়া গেল বাড়িটা,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

কাঠের বেড়া শেষ। একটা পাথরের দেয়ালের কাছে চলে এল ওরা। ওটার পাশ দিয়ে এল ভাঙাচোরা একটা গেটের কাছে।

ভেতরে পা রেখেই লাফিয়ে সরে এল রবিন।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আলো ফেলো তো। ডোবায় না পড়ি।'

দেখা গেল, ডোবায় পা ডোবেনি রবিনের, বৃষ্টির পানি জমেছে ছোট একটা

গর্তে। গর্তটার পাশ কাটিয়ে এল দুজনে।

কাদা প্যাচপ্যাচ করছে সরু পথে। পথের শেষ মাথায় বাড়ির সাদা দেয়াল, ছোট একটা দরজা। পেছনের দরজা হবে, ভাবল মুসা। পাশের জানালা দিয়ে আলো আসছে।

জানালার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল ওরা। মাথা নিচু করে সেলাই করছে এক বৃদ্ধা।

দরজার পাশে ঘণ্টার দড়ি-টড়ি কিছু দেখতে পেল না মুসা। জোরে ধাক্কা দিল। সাড়া নেই। বন্ধ রইল দরজা। উঁকি দিল আবার জানালা দিয়ে। তেমনি ভাবে সেলাই করছে মহিলা, নড়েওনি।

'কানে শোনে না নাকি?' বলতে বলতেই দরজায় কিল মারল মুসা। সাড়া মিলল না এবারও। খবরই নেই যেন মহিলার।

'এভাবে কিলাকিলি করে কিছু হবে না,' দরজার নব ধরে মোচড় দিল মুসা।

ঘুরে গেল নব। ঠেলা দিতেই পাল্লাও খুলল।

পা মোছার জন্যে ছেঁড়া একটা মাদুর বিছানো রয়েছে পাল্লার ওপাশে। তারপরে সরু প্যাসেজ। প্যাসেজের মাথায় পাথরের সিঁড়ি। সদর দরজার কাছেই ডানে আরেকটা দরজা, পাল্লা সামান্য ফাঁক। হারিকেনের ম্লান আলো আসছে।

ঠেলে পাল্লা পুরো খুলে ভেতরে পা রাখল মুসা। তার পেছনে রবিন।

তবু তাকাল না মহিলা। সেলাই করেই চলেছে।

একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়াল মুসা।

এইবার দেখতে পেল বৃদ্ধা। চমকে এত জোরে লাফিয়ে উঠল, ঠেলা লেগে উল্টে পড়ে গেল তার চেয়ার।

'সরি,' এভাবে চমকে যাবে বৃদ্ধা, ভাবেনি মুসা। 'দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম। শোনেননি।'

বুকে হাত চেপে ধরে আছে মহিলা। 'ইস্, কি ভয়ই না দেখালে!...কে তোমরা? এই অন্ধকারে কোত্থেকে ?'

চেয়ারটা তুলে আবার জায়গামত সোজা করে রাখল মুসা। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। 'এটা কি ইয়েলো পণ্ড ফার্ম? এর খোঁজেই এসেছি আমরা। রাতটা কাটানো যাবে? আরও দুজন আসছে।'

তর্জনীর মাথা দিয়ে বার দুই কানে টোকা দিল মহিলা, মাথা নাড়ল। 'শুনি না। ইশারায় বলো। পথ হারিয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'এখানে তো থাকতে পারবে না, আমার ছেলে পছন্দ করে না এসব। ও এল বলে। সাংঘাতিক বদরাগী। চলে যাও।'

'মাথা নাড়ল মুসা। জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টিভেজা রাত দেখাল। তার আর রবিনের ভেজা জুতো আর কাপড় দেখাল।

'হুঁ,' পথ হারিয়েছ তোমরা। ভিজেছ। ক্লান্ত। যেতে চাও না, এই তো? আমার ছেলেকে নিয়ে যে বিপদ। অচেনা কাউকে সহ্য করতে পারে না।'

ছুটি

রবিনকে দেখাল মুসা, তারপর হাত তুলে কোণের একটা সোফা দেখাল। নিজের বুকে হাত রেখে সরিয়ে এনে নির্দেশ করল দরজার দিকে।

বুঝল মহিলা। 'তোমার বন্ধু সোফায় থাকবে বলছ। তুমি বাইরে কোন ছাউনি কিংবা গোলাঘরে কাটিয়ে দিতে পারবে।'

আবার মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'কিন্তু সেই একই ব্যাপার, আমার ছেলে পছন্দ করে না...' রবিন আর মুসার ভেজা মুখের দিকে চেয়ে অবশেষে বোধহয় করুণা হলো মহিলার। হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে এগোল একটা দেয়াল-আলমারির দিকে।

দরজা খুলল। আলমারি মনে করেছে দুই গোয়েন্দা, আসলে ওটা ঘরের আরেকটা দরজা। ওপাশ থেকে খুব সরু কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে।

রবিনকে বলল মহিলা, 'তুমি ওপরে চলে যাও। কাল সকালে আমি না ডাকলে আর নামবে না। আহ্, যাও দেরি কোরো না।'

মুসার দিকে চেয়ে দ্বিধা করছে রবিন। 'তুমি ?'

'তুমি যাও তো,' রবিনের হাত ধরে ঠেলে দিল মুসা। 'আমি গোলাঘরে গিয়ে থাকি। গিয়ে দেখো জানালা-টানালা আছে কিনা। রাতে বেকায়দা দেখলে ডেকো। নিচেই থাকতে হবে আমাকে।'

'ঠিক আছে,' গলা কাঁপছে রবিনের, অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে।

নোংরা পুরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল খুদে একটা চিলেকোঠায়। একটা মাদুর আছে, পরিষ্কারই, আর একটা চেয়ার। একটা কম্বল ভাঁজ করা রয়েছে চেয়ারের হেলানে, বসার জায়গায় এক জগ পানি।

ছোট জানালাও আছে একটা। ওটা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডাকল রবিন, 'মুসা? মুসা?'

'হ্যাঁ, শুনছি,' নিচ থেকে সাড়া দিল মুসা। 'চুপচাপ শুয়ে থাকো। অসুবিধে না হলে আর ডেকো না।'

চার

সঙ্গে খাবার যা আছে খেয়ে নিল রবিন। ঢকঢক করে আধ জগ পানি খেয়ে মাদুরের ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। জিনা আর কিশোরের সাড়ার আশায় কান খাড়া। কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ খোলা রাখতে পারল না। সারা দিন অনেক পরিশ্রম গেছে। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

বাইরে বেশি হাঁটাহাঁটি করার সাহস হলো না মুসার। বৃদ্ধার ছেলের সামনে যদি পড়ে যায়? সহজেই খুঁজে পেল গোলাঘরটা। টর্চের আলো সাবধানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল।

ঘরের এক কোণে খড়ের গাদা। শোয়ার জায়গা পাওয়া গেল। ভাঙা একটা বাক্স দেখে সেটা তুলে এনে দরজার পাশে রেখে বসল। ভাঙা গেটটা দেখা যায়। কিশোর আর জিনা আসবে তো এই বৃষ্টির মাঝে? এলে কি ওই গেট দিয়েই ঢুকবে?

পেটের ভেতর ছুঁচো নাচছে। খাবার বের করে খেতে শুরু করল মুসা, একই সঙ্গে চোখ রাখল গেটের দিকে। বৃদ্ধার ছেলে এলে দেখতে পাবে।

ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। ঘন ঘন হাই তুলছে। তবু জোর করে চোখ খোলা রেখে বসে রইল।

কেউ এল না। দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালেই চোখে পড়ে বাড়ির জানালা। বৃদ্ধাকে দেখা যায়, সেলাই করছে।

দু-ঘণ্টা পেরোল। আটটা বাজে। জিনা আর কিশোরের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে মুসা।

ঝুড়িতে সেলাইয়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখল বৃদ্ধা। মুসার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, ফিরে এল না। হারিকেনটা আগের জায়গায়ই জ্বলছে, ছেলের জন্যেই জ্বেলে রেখে গেছে বোধহয় বৃদ্ধা, মুসা ভাবল।

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। তারা ফুটেছে। ছুটে চলা মেঘের ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে চাঁদ। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে আসবে।

প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভয় অনেকখানি কেটে গেল মুসার। গোলাঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে এগোল জানালার দিকে। মনে কৌতূহল। কি করছে বৃদ্ধা?

কোণের নড়বড়ে সোফাটায় শুয়ে পড়েছে মহিলা। গলা পর্যন্ত তুলে দিয়েছে কম্বল। বোধহয় ঘুমিয়ে গেছে।

আগের জায়গায় ফিরে এল মুসা। জিনা আর কিশোরের জন্যে বসে থেকে আর লাভ আছে?—ভাবল সে। রাতে ওরা ফিরবে বলে মনে হয় না। রাফিয়ানকে ডাক্তার দেখিয়ে র‍্যাংকিন ভিলেজে ফিরে সরাইখানায় রাত কাটানোটাই স্বাভাবিক। বৃষ্টি না হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল।

বড় করে হাই তুলল সে। 'যাই, শুয়ে পড়িগে,' মনে মনে বলল। 'যদি আসেই ওরা, সাড়া পাব।'

দরজা বন্ধ করল মুসা। খিল-টিল কিছু নেই। দুটো করে আঙটা লাগানো আছে ভেতরে-বাইরে। ভেতরের আঙটা দুটোয় দুটো লাঠি ঢুকিয়ে আটকে দিল সে। খিলের বিকল্প। কেন এই সাবধানতা, নিজেই জানে না। হয়তো অবচেতন মনে রেখাপাত করেছে বৃদ্ধার ছেলের বদমেজাজের কথাটা।

খড়ের গাদায় শুতে না শুতেই ঘুমে অচেতন হয়ে গেল মুসা।

বাইরে আরও পরিষ্কার হয়েছে আকাশ। বেরিয়ে এসেছে চাঁদ, পূর্ণতা পায়নি এখনও, তবে যথেষ্ট বড় হয়েছে। পাথরের পুরানো বাড়িটাকে কেমন রহস্যময় করে তুলেছে ঘোলাটে জ্যোৎস্না।

ঘুমাচ্ছে মুসা। স্বপ্নে দেখছে রাফিয়ানকে, জিনা, কিশোর আর ভাঙা বাড়িটাকে, কানে আসছে যেন ঘণ্টাধ্বনি।

হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুম। প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। আরি, খোঁচা লাগছে কেন? বিছানায় কাঁটা ছড়িয়ে দিল নাকি কেউ? তারপর মনে পড়ল, খোঁচা তো লাগবেই। শুয়ে আছে খড়ের গাদায়। কাত হয়ে শুলো, কুঁজো হয়ে।

ছুটি

একটা মৃদু শব্দ কানে এল। গোলাঘরের কাঠের বেড়ায় আঁচড়ের মত। উঠে বসল মুসা। ইঁদুর?

কান পেতে আছে সে। শব্দ ঘরের ভেতর নয়, বাইরে থেকে আসছে। থেমে, একটা নির্দিষ্ট সময় বিরতি দিয়ে আবার শুরু হলো। তারপর, মুসার ঠিক মাথার ওপরে ভাঙা একটা জানালায় আলতো টোকা দিল কেউ।

চুপ করে আছে মুসা। ইঁদুরে আঁচড়াতে পারে, কিন্তু টোকা দিতে পারে না। তাহলে কে? দম বন্ধ করে পড়ে রইল সে।

'রবিন! রবিন?' ফিসফিসিয়ে ডাকল কেউ।

সাড়া দিতে গিয়েও দিল না মুসা। গলাটা অচেনা, কিশোরের মত লাগছে না। কিন্তু রবিনের নাম জানল কি ভাবে? কেউ যে শুয়ে আছে ঘরে, এটাই বা কি করে জানল?'

আবার টোকার শব্দ হলো। গলা আরেকটু চড়িয়ে ডাকল লোকটা, 'রবিন। রবিন?'

না, কিশোর নয়। জিনা তো নয়ই।

'ওঠো,' বলল লোকটা। 'অনেক দূর যেতে হবে আমাকে। ওই মেসেজটা নিয়ে এসেছি।'

জানালার কাছে যাওয়া উচিত হবে না, ভাবল মুসা। কিন্তু এ-ও চায় না, কোন সাড়া না পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ুক লোকটা। জানালার চৌকাঠের কাছে মাথা তুলল সে, কিন্তু মুখ বের করল না। মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে কণ্ঠস্বর বিকৃত করে ফিসফিস করে জবাব দিল, 'আছি, বলো।'

'এত ঘুম?' বিরক্ত হয়ে বলল লোকটা। 'কখন থেকে ডাকছি। শোনো, জেরি মেসেজ দিয়েছে। টু-ট্রীজ। ব্ল্যাক ওয়াটার। ওয়াটার মেয়ার। আরও বলেছে, টিকসি নোজ। তোমাকে এটা দিতে বলেছে, টিকসির কাছে আছে আরেকটা। নাও,' জানালা দিয়ে এক টুকরো কাগজ ছেড়ে দিল সে ভেতরে।

বেড়ার ছোট একটা ছিদ্র দিয়ে দেখছে মুসা। বিষণ্ণ মুখ, কুতকুতে চোখ, মাথাটা দেখতে অনেকটা বুলেটের মত।

'রবিন?' আবার বলল লোকটা। 'সব মনে রাখতে পারবে তো? টু ট্রীজ। ব্ল্যাক ওয়াটার। ওয়াটার মেয়ার। টিকসি নোজ।...যাই তাহলে।'

চলে গেল লোকটা।

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে ভাবছে মুসা। কে লোকটা? রবিনের নাম জানল কিভাবে? আর তাকেই বা রবিন মনে করার কারণ কি? রবিনের নাম যখন জানে, তার নাম কি জানে না? রাত দুপুরে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কি এক অদ্ভুত মেসেজ দিয়ে গেল, মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যায় না।

ঘুম আর আসবে না সহজে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুসা। কিচ্ছু নেই, শুধু রহস্যময় বাড়িটার নির্জনতা, আর খোলা আকাশ।

খড়ের গাদায় বসে পড়ল সে। টর্চ জ্বেলে দেখল কাগজের টুকরোটা। ময়লা, এক পাতার ছেঁড়া অর্ধেক। পেনসিলে কিছু আঁকিবুঁকি রয়েছে, যার কোনই মানে

বোঝা যায় না। কিছু শব্দ রয়েছে এখানে ওখানে, যেগুলো আরও দুর্বোধ্য।

'আমার মাথায় কুলোবে না,' আনমনে বলতে বলতে কাগজটা পকেটে রেখে দিল সে। শুয়ে পড়ল আবার।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা আসছে। কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে গেল মুসা, গায়ের ওপর কিছু খড় টেনে দিল। ঠাণ্ডা কম লাগবে।

শুয়ে শুয়ে ভাবছে। তন্দ্রা লাগল একসময়।

কিন্তু পুরোপুরি ঘুম আসার আগেই টুঁটে গেল আবার। বাইরে সতর্ক পায়ের শব্দ। ফিরে এল লোকটা ?

দরজার বাইরে এসে থামল পদশব্দ। ঠেলা দিল পাল্লায়। খুলল না দেখে জোরে ধাক্কা দিল। সে বোধহয়, ভাবছে, কোন কিছুর সঙ্গে আটকে গেছে পাল্লা। ঠেলাঠেলিতে আঙটা থেকে খসে পড়ল লাঠি, ভেতরে ঢুকল লোকটা। আবার ভেজিয়ে দিল দরজা।

দরজার কাছে পলকের জন্যে লোকটার চেহারা দেখেছে মুসা। না, বুলেট-মাথা নয়। এর মাথায় ঘন কালো ঝাঁকড়া চুল। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর। খড়ের গাদায় শুতে আসবে না তো লোকটা?

না, এল না। একটা চটের বস্তার ওপর বসে নিজে নিজেই কথা শুরু করল। 'হলো কি? আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?' বিড়বিড় করে আরও কিছু বলল, বুঝতে পারল না মুসা।

'দূর কি হলো?' বলে উঠল লোকটা। মাথার ওপর দু-হাত তুলে গা মোড়ামুড়ি করল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আবার দরজার কাছে। বাইরে উঁকি দিয়ে কি দেখল, ফিরে এসে বসল আবার আগের জায়গায়।

বিড়বিড় করছে না আর, একেবারে চুপ। হাই তুলছে।

সত্যিই দেখছে তো, অবাক হয়ে ভাবল মুসা, নাকি স্বপ্ন?

চুপ করে পড়ে রইল সে। স্বপ্ন দেখতে শুরু করল এক সময়, একটা বনের ভেতর দিয়ে চলেছে। যেদিকেই তাকায়, শুধু জোড়ায় জোড়ায় গাছ। বিচিত্র ঘণ্টার শব্দ কানে বাজছে একটানা।

দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল মুসার। সকাল হয়ে গেছে। প্রথমেই চোখ গেল বস্তাটার দিকে। কেউ নেই। গোলাঘরে খড়ের গাদার ভেতরে শরীর ডুবিয়ে রয়েছে সে একা।

পাঁচ

উঠে আড়মোড়া ভাঙল মুসা। সারা গায়ে ধুলো-মাটি, নোংরা। খিদেও পেয়েছে। আচ্ছা, পয়সা পেলে রুটি, পনির আর এক গেলাস দুধ দেবে তো বৃদ্ধা? রবিনেরও নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। কি অবস্থায় আছে কে জানে।

সাবধানে বাইরে বেরোল মুসা। চিলেকোঠার জানালার নিচে এসে দাঁড়াল। রবিনের উদ্বিগ্ন মুখ দেখা যাচ্ছে।

'কেমন?' হাত নেড়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ভাল,' হাসল রবিন। 'কিন্তু নিচে তো নামতে পারছি না। মহিলার ছেলে সাংঘাতিক বদমেজাজী। কয়বার যে গালাগাল করেছে বেচারী বুড়িটাকে। কানে শোনে না, এটা যেন তার দোষ।'

'তাহলে ও বেরিয়ে যাক,' চট করে ফিরে তাকাল মুসা, কে জানি আসছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ঢুকল আবার গোলাঘরে।

বেড়ার ছিদ্র দিয়ে দেখল, বেঁটে এক লোক, চওড়া কাঁধ, সোজা হয়ে দাঁড়ালে সামান্য কুঁজো মনে হয়, মাথায় এলোমেলো চুলের বোঝা। গতরাতে দ্বিতীয় বার একেই ঢুকতে দেখেছে মুসা।

আরে, এদিকেই তো আসছে।

কিন্তু না, গোলাঘরে ঢুকল না লোকটা। পাশ দিয়ে চলে গেল। গেট খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে এল মুসার।

'চলে গেছে,' ভাবল মুসা। 'যাই এবার।'

আবার বেরোল গোলাঘর থেকে।

দিনের আলোয় বড় বেশি বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ছোট্ট সাদা বাড়িটাকে। নিঃসঙ্গ, নির্জন।

ঘরে ঢুকল মুসা। রান্নাঘরে পাওয়া গেল বৃদ্ধাকে। সিংকে বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছে। মুসাকে দেখে অস্বস্তি ফুটল চোখে। 'ও, তুমি। ভুলেই গিয়েছিলাম তোমাদের কথা। জলদি তোমার বন্ধুকে নিয়ে চলে যাও। আমার ছেলে দেখলে...'

'কিছু রুটি আর পনির দিতে পারবেন?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। বুঝল, লাভ হবে না। গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও শুনতে পাবে না মহিলা, একেবারেই কালা। হাত তুলে টেবিলে রাখা রুটি দেখাল সে।

'না না!' আঁতকে উঠল বৃদ্ধা। 'জলদি চলে যাও। আমার ছেলে এসে পড়বে।'

ঠিক এই সময় পায়ের শব্দ হলো। মুসা কিছু করার আগেই ঘরে ঢুকল লোকটা, যাকে খানিক আগে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।

হাতের ছোট ঝুড়িতে কয়েকটা ডিম।

চোখ গরম করে তাকাল লোকটা। 'এই ছেলে, এখানে কি? কি চাই?'

'না, কিছু না...মানে, এই...আমাদের কাছে কিছু রুটি বেচবে কি না...'

'আমাদের? তুমি একা নও?'

নিজেকে জুতোপেটা করতে ইচ্ছে হলো মুসার, মুখ ফসকে 'আমাদের' বলে ফেলেছে। কিন্তু ফেলেছে তো ফেলেছেই, কথা ফিরিয়ে নেয়া আর যাবে না। চুপ করে রইল।

'কি হলো? রা নেই কেন?' গর্জে উঠল লোকটা। 'এতক্ষণে বুঝলাম, ডিম যায় কোথায়? তোমরাই চুরি করো রোজ...দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা...'

আর কি দাঁড়ায় মুসা? ঝেড়ে দিল দৌড়। গেট পেরিয়ে ছুটল। দুপদুপ করছে বুক, পেছনে তাকানোর সাহস নেই।

পায়ের আওয়াজ নেই শুনে ফিরে তাকাল মুসা। আসেনি লোকটা। ঘর

থেকেই বোধহয় বেরোয়নি।

পায়ে পায়ে আবার গেটের কাছে ফিরে এল মুসা। উঁকি দিয়ে দেখল, একটা বড় কাঠের পাত্র হাতে নিয়ে উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে লোকটা, সাদা বাড়ির পেছনে। বোধহয় মুরগীর খাবার দিতে যাচ্ছে।

এই-ই সুযোগ। ঢুকে পড়ল মুসা। চিলেকোঠার জানালায় দেখা যাচ্ছে রবিনের মুখ। ইশারায় নেমে আসতে বলল তাকে মুসা।

রবিন নেমে আসতেই আর দাঁড়াল না। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল দুজনে। তাড়াতাড়ি পা চালাল।

আশপাশের অঞ্চল রাতে লেগেছিল এক রকম, এখন লাগছে আরেক রকম।

অনেকখানি আসার পর প্রথম কথা বলল রবিন, 'আরিব্বাপরে! সাংঘাতিক হারামী লোক। আর ওটা একটা ফার্ম হলো নাকি? গরু-শুয়োর কিচ্ছু নেই। একটা কুত্তাও না।'

'মনে হয় না ওটা ফার্ম,' বেড়ার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা, ফিরে তাকাল একবার বাড়ির ভাঙা গেটের দিকে। 'শিওর, পথ হারিয়েছিলাম কাল রাতে। ভুল জায়গায় উঠেছি। ইয়েলো পণ্ড ফার্ম হতেই পারে না।'

'কাজটা খারাপ হয়ে গেল তাহলে,' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল রবিন। 'কিশোর আর জিনা নিশ্চয় ফার্মে উঠেছে। আমাদের জন্যে খুব ভাববে।'

'হ্যাঁ,' ছোট একটা পুকুর দেখে ঘুরল মুসা। 'চলো, হাত-মুখ ধুয়ে নিই। চেহারার যা অবস্থা হয়েছে একেকজনের। লোকে দেখলে পাগল ভাববে।'

হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নিল দুজনে। ময়লা কাপড় ভরে রাখল ব্যাগে, পরে সময়-সুযোগমত ধুয়ে নেবে।

পাড়ের ওপর উঠতেই একটা ছেলেকে দেখতে পেল, শিস দিতে দিতে আসছে। 'হাল্লো,' বলল হাসিখুশি ছেলেটা। 'ছুটি কাটাতে বেরিয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আচ্ছা ভাই, ইয়েলো পণ্ড ফার্মটা কোথায়? ওই ওটা?' বৃদ্ধার বাড়িটা দেখাল।

'আরে দূর, ওটা ফার্ম নাকি? ও-তো মিসেস হ্যাগার্ডের বাড়ি। নোংরা।' নাক কুঁচকাল ছেলেটা। 'ওটার ধারে-কাছে যেয়ো না। বুড়ির ছেলে একটা ইবলিস, গাঁয়ের লোকে ওর নাম রেখেছে ডারটি রবিন।...ইয়েলো পণ্ড ওই ওদিকে। র‍্যাংকিন রেস্ট ছাড়িয়ে গিয়ে, বাঁয়ে।'

'থ্যাংকু,' বলল মুসা।

মাঠের পথ ধরে হেঁটে চলেছে রবিন আর মুসা। পেটে খিদে । মনে ভাবনা। কিশোর আর জিনা নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তা করছে।

সরু পথটার কাছে এসে থামল, সেই যে সেই পথটা, যেটার দু-ধারে পাতাবাহারের জঙ্গল পথকে সুড়ঙ্গ বানিয়ে দিয়েছে।

হাত তুলে দেখাল রবিন, 'ওই যে দেখো, কোথায় নেমে যাচ্ছিলাম। নালা।'

'নালায়েকের বাচ্চা,' বিড়বিড় করে টমটমওয়ালাকে গাল দিল মুসা।

র‍্যাংকিন রেস্টের কাছে আসতেই কিশোর আর জিনার দেখা পাওয়া গেল।

মুসা আর রবিনকে আগেই দেখেছে ওরা, নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। তাদের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে আসছে রাফিয়ান।

নাস্তা কেউই খায়নি। র‍্যাংকিন রেস্টে ঢুকল ওরা।

এগিয়ে এল সেই মহিলা, গতদিন ডাস্টার দিয়ে যে জানালা পরিষ্কার করছিল। 'কি চাই?'

'নাস্তা খাইনি এখনও,' বলল কিশোর। 'কিছু আছে?'

'পরিজ আর মাখন,' জানাল মহিলা। 'আর আমাদের নিজেদের কাটা গরু, নিজেদের মুরগীর ডিম। নিজেদের হাতে চাক ভেঙে মধু এনেছি আমরা, আর পাঁউরুটি আমি নিজে বানিয়েছি। চলবে? কফিও আছে।'

'ইস্, আন্টি, জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে আপনাকে,' দাঁত আর একটাও ভেতরে রাখতে পারছে না মুসা। 'জলদি করুন। এক বচ্ছর কিছু খাইনি।'

হেসে চলে গেল মহিলা।

ছোট গোছানো ডাইনিং রুমে আরাম করে বসল অভিযাত্রীরা। খানিক পরেই রান্নাঘর থেকে ভেসে এল ভাজা মাংস আর কড়া কফির জিভে পানি আসা গন্ধ। লম্বা জিভ বের করে ঠোঁট চাটল রাফিয়ান।

কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল মুসা, 'ও তো দেখছি ভাল হয়ে গেছে। মিস্টার নরিসের ওখানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'গিয়ে দেখলাম বাড়ি নেই। তাঁর স্ত্রী বললেন, এসে পড়বেন শিগগিরই। খুব ভাল মহিলা। বসতে দিলেন। বসলাম।'

'কিন্তু শিগগির আসেননি ভদ্রলোক,' জিনা যোগ করল। 'কাজে আটকে গিয়েছিলেন। সাড়ে সাতটার পর এলেন। খুব খারাপ লাগছিল, তাঁদের খাওয়ার সময় তখন।'

'তবে মিস্টার নরিসও ভাল,' বলল কিশোর। 'রাফির পা দেখল, চেপে ধরে কি জানি কি করল···এমন জোরে কাঁউ করে উঠল রাফি, যেন ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে···জিনা গিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল মিস্টার নরিসের ওপর···হাহ্ হাহ্···ভদ্রলোক তো হেসেই বাঁচেন না···'

'যাব না,' চোখমুখ ঘুরিয়ে বলল জিনা। 'যা ব্যথা দিয়েছে···'

'ডাক্তার যা করেন, বুঝেশুনেই করেন···'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি,' আবার রাফিয়ানের মাথায় হাত বোলাল মুসা। 'একেবারে ভাল হয়ে গেছে। তারপর কি করলে?'

'খাওয়ার জন্যে চাপাচাপি শুরু করলেন মিসেস নরিস,' বলল কিশোর। 'কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। খাওয়ার পর বেরোতেও দিতে চাইলেন না। বললেন, বৃষ্টিবাদলার মধ্যে গিয়ে কি করবে, শুয়ে থাকো এখানেই। তোমরা ভাববে বললাম। শেষে, ন-টা বাজার পর আকাশ পরিষ্কার হলে ছাড়লেন। ইয়েলো পণ্ডে গিয়ে তোমাদের পেলাম না। ভাবলাম, বৃষ্টিতে আটকে গেছ, অন্য কোথাও রাত কাটাতে উঠেছ। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। এতক্ষণে না পেলে পুলিশকে জানাতাম।'

'ফার্মটা কিন্তু দারুণ,' মাথা কাত করল জিনা। 'ছোট একটা ঘরে থাকতে দিল আমাদের। বিছানা বেশ নরম। আমার বিছানার পাশে নিচে রাফি শুয়েছিল।'

'আর কি কপাল,' কপাল চাপড়াল মুসা, 'আমি কাটিয়েছি খড়ের গাদায়...'

মস্ত ট্রে-তে খাবার বোঝাই করে নিয়ে ঘরে ঢুকল মহিলা। পরিজ থেকে ধোঁয়া উঠছে। সাদা বিরাট বাটিতে সোনালি মধু। ইয়া বড় এক ডিশ ভরতি মাংস-ভাজা আর ডিম সেদ্ধ। আরেকটা বাসনে ভাজা ব্যাঙের-ছাতাও রয়েছে।

'খাইছে!' হাততালি দিয়ে উঠল মুসা। ঢোক গিলল।

টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল মহিলা, 'এগুলো খাও। টোস্ট, ডিম ভাজা আর মাখন নিয়ে আসছি। দুধ-কফি পরে আনব। নাকি এখনি?'

'না না,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা, 'পরেই আনুন।' একটা ডিম তুলে নিয়ে আস্ত মুখে পুরল। সেটা অর্ধেক চিবিয়েই এক টুকরো মাংস নিয়ে কামড় বসাল। প্লেটে খাবার তুলে নেয়ার তর সইল না।

হেসে যার যার প্লেট টেনে নিল অন্যেরা। খাবার তুলে নিল প্লেটে। বাকি খাবার সহ ট্রে-টা মুসার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল জিনা, 'নাও, রাফিয়ানকেও কিছু দিয়ো।'

'কি আর বলব রে ভাই,' ব্যাঙের ছাতার শেষ টুকরোটা মুখে পুরল মুসা। 'অন্ধকারে গিয়ে উঠেছিলাম এক বান্দরের বাড়িতে। রবিন, তুমি বলো।' দরজায় দেখা দিয়েছে মহিলা, হাতে আরেক ট্রে, লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেদিকে গোয়েন্দা সহকারী।

সংক্ষেপে জানাল রবিন, পথ হারিয়ে কিভাবে গিয়ে উঠেছিল বাড়িটাতে।

বাধা না দিয়ে চুপচাপ শুনল কিশোর, তারপর বলল, 'ঘণ্টা শুনে ভয় পেয়েছে, নিশ্চয় মুসা ভূতের ভয় ঢুকিয়েছে তোমার মনে?'

জোরে জোরে দু-হাত নাড়ল মুসা, কি বোঝাতে চাইল সে-ই জানে। মুখ ভর্তি খাবার, কথা বলতে পারছে না।

'অ, তোমরা তাহলে শোনোনি কিসের ঘণ্টা,' বলল কিশোর। 'পাগলা-ঘন্টি, মিসেস নরিস বলেছেন। জেল থেকে কয়েদী পালালে নাকি ওরকম বাজিয়ে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয় গ্রামবাসীকে।'

'আর আমরা এদিকে কি ভয়ই না পেয়েছিলাম,' মলিন হেসে মাথা নাড়ল রবিন।

নাস্তা শেষ হলো। এক টুকরো খাবারও পড়ে রইল না। উচ্ছিষ্টও না। যা ছিল, সাবাড় করে দিয়েছে রাফিয়ান।

'কিছু স্যাণ্ডউইচ কিনে নেয়া দরকার,' বলল কিশোর। 'দুপুরে খাওয়ার জন্যে।'

'হ্যাঁ, নাও,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা।

বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে কিশোর বলল, 'মুসা, রবিনের কথা তো বললে। তুমি গোলাঘরে কিভাবে রাত কাটালে বললে না তো।'

এতক্ষণে মনে পড়ল মুসার, রবিনকেও বলা হয়নি রাতের কথা। বলার অবকাশও পায়নি অবশ্য। দুজনে তখন ইয়েলো পণ্ড খোঁজায় এত ব্যস্ত, পেটে খিদে,

আলাপ করার মানসিকতাই ছিল না।

'এক কাণ্ড হয়েছে কাল রাতে,' বলল মুসা। 'ওটা সত্যি ভূতের বাড়ি।'

'তোমার কাছে তো সবই ভূত,' হাত নাড়ল কিশোর। 'চলো, কোথাও বসে শুনি। মনে হচ্ছে, অনেক কিছু বলার আছে তোমার।'

নির্জন একটা জায়গা দেখে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসল ওরা।

সব খুলে বলল মুসা। চুপ করে শুনল সবাই।

পকেট থেকে কাগজটা বের করে দিল মুসা। ওটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল অন্যেরা। এমন কি রাফিয়ানও ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল, যেন মহা-পণ্ডিত।

'আগামাথা কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'তবে নকশা-টকশা কিছু হবে। কিসের কে জানে।'

'ব্যাটা বলল,' জানাল মুসা, 'টিকসির কাছে নাকি বাকি অর্ধেক আছে।'

'এই টিকসিটা কে?' বলল জিনা।

'আল্লাহ্ মালুম।'

'রবিনের নামই বা জানল কিভাবে? এই কিশোর, কি ভাবছ?' কনুই দিয়ে কিশোরের পাঁজরে গুঁতো দিল জিনা।

'বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়ল কিশোর।

'আমি পারছি,' দু-আঙুলে চুটকি বাজাল হঠাৎ রবিন।

জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাল কিশোর।

'মুসা, ছেলেটা কি বলেছিল?' বলল রবিন। 'বলেছিল বুড়ির ছেলের নাম ডারটি রবিন রেখেছে লোকে। গতরাতে আমাকে নয়, ওকেই ডেকেছিল বুলেট-মাথা। বুড়ির ছেলে গোলাঘরে তার জন্যেই অপেক্ষা করেছে। জানে না, আগেই এসে তোমাকে ডারটি ভেবে মেসেজ দিয়ে চলে গেছে লোকটা।'

'ঠিক বলেছ,' একমত হলো মুসা।

আনমনে বলল শুধু কিশোর, 'হুঁ।'

'জেল পালানো কয়েদীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই তো?' প্রশ্ন রাখল জিনা।

'অসম্ভব না,' বলল কিশোর। 'হতেও পারে। মেসেজটা সে-ই দিয়ে গেছে হয়তো। কিন্তু কার কাছ থেকে আনল?'

'জেরি?' মুসা বলল।

'জেরি, না? হতে পারে। হয়তো সে এখন জেলে আছে, তার বন্ধু বুলেট-মাথা, পালিয়েছে। বন্ধুর কাছেই মেসেজটা দিয়েছে সে। তাহলে ডারটি রবিন ওদেরই দলের কেউ। কোন বদ-মতলব আছে ব্যাটাদের।'

'কি মতলব?'

'তা জানি না। তবে হতে পারে, পাগলাঘন্টি শুনেই ডারটি বুঝেছে, যে তার বন্ধু পালিয়েছে। মেসেজ নিয়ে আসবে তার কাছে। তাই গোলাঘরে এসে বসেছিল মেসেজের আশায়।'

'হ্যাঁ, তাই হবে,' মাথা দোলাল মুসা।

'অথচ ভুলে মেসেজটা পড়ল এসে তোমার হাতে,' রবিন বলল। 'মুসা, ভূতই

মনে হয় গতরাতে আমাদেরকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল ওখানে, কোন একটা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে…'

'ধ্যাত, সব বাজে কথা,' হাত নেড়ে মাছি তাড়াল যেন জিনা। 'চলো, গিয়ে পুলিশকে জানাই। কয়েদী ধরতে সুবিধে হবে তাদের।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ছুটিতে এসেছি আনন্দ করতে, ডাকাত-টাকাতের খপ্পরে পড়তে চাই না।' ম্যাপ বের করে নীরবে দেখল মিনিটখানেক। 'এই থানা-টানা থাকলে এখানেই থাকবে।'

উঠল ওরা। খুশি হলো রাফিয়ান। নাস্তার পর পরই এত সময় ধরে বসে থাকাটা মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না তার। লাফাতে লাফাতে আগে আগে চলল সে।

'পা তো একেবারে ভাল,' ছুটিটা মাঠে মারা যায়নি বলে রবিনও খুশি। 'ভালই হয়েছে, শিক্ষা হয়েছে একটা। বোকার মত আর খরগোশের গর্তে ঢুকবে না।'

হ্যাঁ, সত্যই শিক্ষা হয়েছে রাফিয়ানের। আর গর্তে ঢুকল না। তবে পরের আধ ঘণ্টায় অন্তত ডজনখানেক বার মুখ ঢোকাল খরগোশের গর্তে। ধরা তো দূরের কথা, ছুঁতেও পারল না কোনটাকে। ওর চেয়ে খরগোশের পাল অনেক বেশি ত্যাঁদড়।

খোলা মাঠে বুনো ঘোড়া চরছে।

একবার একটা পাহাড়ী পথে মোড় নিতেই মুখোমুখি হয়ে গেল একপাল বুনো ঘোড়ার। অবাক চোখ মেলে অভিযাত্রীদের দেখল। তারপর একই সঙ্গে ঘুরে খুরের খটাখট তুলে দ্রুত হারিয়ে গেল পাহাড়ের ঢালের বনে। পিছু নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠল রাফিয়ান, জোর করে তার গলার বেল্ট টেনে ধরে রাখল জিনা।

'খুব সুন্দর, না?' বলল সে। 'আদর করতে ইচ্ছে করে।'

গতদিনের মতই সকালটা সুন্দর, রোদে উজ্জ্বল। পায়ের তলায় সবুজ ঘাস। একটা ঝর্নার পাড় দিয়ে হাঁটছে এখন। মৃদু ঝিরঝির করে বইছে টলটলে পানি, যেন গান গেয়ে নেচে নেচে ছুটে চলেছে মাতোয়ারা হয়ে।

দুপুরের দিকে জুতো খুলে ঝর্নায় পা ডুবিয়ে বসল ওরা। পায়ে হালকা পালকের মত পরশ বোলাচ্ছে পানি।

স্যাণ্ডউইচ দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে পেট পুরে খেলো ঝর্নার পানি।

পানিতে পা রেখেই নরম ঘাসে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল জিনা। খোলা নীল আকাশের দিকে তামাটে চোখ। হলুদ রোদে যেন জ্বলছে তামাটে চুল। খুব সুন্দর লাগছে তাকে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার শুরু হলো চলা।

ডিয়াটোতে কখন পৌঁছবে জানে না। তবে তাড়াও নেই। সাঁঝের আগে কোন ফার্মহাউস খুঁজে পেলেই হলো। রাতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

'থানা থাকলে সেটা খুঁজে বের করতে হবে আগে,' বলল কিশোর। 'তারপর ফার্ম…'

ছয়

ডিয়াটোতে থানা আছে। ছোট্ট থানা, একজন মাত্র গ্রামরক্ষী। আশপাশের চারটে গাঁয়ের দায়িত্বে রয়েছে সে, ফলে নিজেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট না ভাবলেও বেশ দামী লোক মনে করে। শেরিফ হলে কি করত কে জানে।

গ্রামরক্ষী সাহেবের বাড়িটাই থানা। আরামে বসে ডিনার খাচ্ছে, এই সময় এসে হানা দিল অভিযাত্রীরা। লোভনীয় সসেজ আর তাজা কাটা পেঁয়াজগুলোর দিকে তাকিয়ে উঠে এল বিরক্ত হয়ে।

'কি চাই?' কম-বয়েসীদের দু-চোখে দেখতে পারে না লোকটা। তার মতে, সব ছেলেমেয়েই বিচ্ছু, গোলমাল পাকানোর ওস্তাদ। কিশোর-বয়েসীগুলো বেশি ইবলিস।

'অদ্ভুত কতগুলো ঘটনা ঘটেছে, স্যার,' ভদ্রভাবে বলল কিশোর। 'ভাবলাম, শেরিফকে জানানো দরকার। আপনি কি শেরিফ?'

'অ্যাঁ?...হ্যাঁ...না না, কি বলবে বলো জলদি।'

'গতরাতে একজন কয়েদী পালিয়েছিল।'

'মরেছে,' বলে উঠল লোকটা, 'তুমিও দেখেছ বলতে এসেছ। কতজন যে এল, সবাই নাকি দেখেছে। একজন লোক একসঙ্গে এতগুলো জায়গায় যায় কি করে, ঈশ্বরই জানে।'

'আমি না,' শান্ত রইল কিশোর, 'আমার এই বন্ধু। গতরাতে সত্যি দেখেছে। একটা মেসেজ নিয়ে এসেছিল লোকটা।'

'তাই নাকি?' তরল কণ্ঠে বলল গ্রামরক্ষী। 'তোমার বন্ধু তাহলে আরেক কাটি বাড়া। শুধু দেখেইনি, মেসেজও পেয়েছে। তা মেসেজটা কি? স্বর্গে যাওয়ার ঠিকানা?'

অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বলল মুসা, 'টু-ট্রীজ, ব্ল্যাক ওয়াটার, ওয়াটার মেয়ার, টিকসি নোজ।'

'বাহ্, বেশ ভাল ছন্দ তো,' ব্যঙ্গ করল গ্রামরক্ষী। 'টিকসিও জানে। তাহলে টিকসিকে গিয়ে বলো, কি কি জানে এসে বলে যেতে আমাকে। তোমাদের আরেক বন্ধু বুঝি?'

'না, তাকে চিনি না,' অপমানিত বোধ করছে মুসা। কড়া জবাব এসে যাচ্ছিল মুখে, কোনমতে সামলাল। 'আমার জানারও কথা নয়, যদি না লোকটা এসে বলত। ভাবলাম, বুঝতে পারে এমন কাউকে জানিয়ে যাই। এই যে, এই কাগজটা দিয়েছিল।'

ছেঁড়া পাতাটা হাতে নিয়ে দুর্বোধ্য আঁকিবুঁকির দিকে চেয়ে বাঁকা হাসল গ্রামরক্ষী। 'আরে, আবার কাগজও দিয়েছে। কি লেখা?'

'আমি কি জানি?' হাত ওল্টালো মুসা। আর সহ্য করতে পারছে না। 'সে-জন্যেই তো আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। কয়েদী ধরতে সুবিধে হবে ভেবে।'

'কয়েদী ধরব?' কুটিল হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'এত কিছু জানো, আর আসল কথাটা জানো না? কয়েদী ব্যাটা ধরা পড়েছে ঘণ্টাচারেক আগে। ঘোড়ার গাড়ি চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল। এতক্ষণে জেলে ঢোকানো হয়েছে আবার।' কণ্ঠস্বর পাল্টে গেল, হাসি হাসি ভাবটা উধাও হয়েছে চেহারা থেকে। 'আর শোনো, ছেলেছোকরাদের ডেঁপোমি আমি সইতে পারি না। আর কক্ষণো...'

'ডেঁপোমি করছি না, স্যার,' কালো হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। 'সত্যি-মিথ্যে বোঝার ক্ষমতা নেই, চোর ধরেন কি করে?'

রাগে গোলাপী হয়ে গেল গ্রামরক্ষীর গাল। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। তার মুখের ওপর এভাবে আর কখনও বলেনি কেউ। 'দেখো খোকা...'

'আমি খোকা নই। বয়েস আরেকটু বেশি।'

চড়ই মেরে বসবে যেন গ্রামরক্ষী, এত রেগে গেল।

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে লোকটার প্রায় নাকের নিচে ঠেলে দিল কিশোর, 'নিন, এটা পড়লেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

নিচের সই আর সীল দেখেই চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল গ্রামরক্ষীর, সামলে নিল নিজেকে। কাগজটা নিয়ে পড়ল। লেখা আছে ঃ

এই কার্ডের বাহক ভলানটিয়ার জুনিয়র, রকি বীচ পুলিশকে সহায়তা করছে। একে সাহায্য করা মানে পক্ষান্তরে পুলিশকেই সাহায্য করা।

—ইয়ান ফ্লেচার
চীফ অভ পুলিশ
লস অ্যাঞ্জেলেস।

মুখ কালো করে কার্ডটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল গ্রামরক্ষী, 'তা এখন কি করতে হবে আমাকে? রিপোর্ট লিখে নিতে হবে?'

'সেটা আপনার ইচ্ছে,' ঝাল ঝাড়ল কিশোর।

'ঠিক আছে, লিখে নিচ্ছি,' পকেট থেকে নোটবই বের করল গ্রামরক্ষী, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও। 'তবে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এটা তোমাদের রকি বীচ নয়। এখানকার চোর-ছ্যাঁচোড়রা অন্যরকম। গলাকাটা ডাকাত। ওদের সঙ্গে গোলমাল করতে গেলে বিপদে পড়বে।'

'সে-ভয়েই বুঝি কেঁচো হয়ে থাকো, ব্যাটা,' বলার খুব ইচ্ছে হলো কিশোরের। বলল, 'সেটা দেখা যাবে। দিন, আমাদের কাগজটা দিন।'

কয়েকজন কিশোরের কাছে হেরে গিয়ে মেজাজ খিঁচড়ে গেছে গ্রামরক্ষীর, কি ভাবল কে জানে, দুই টানে ফড়াত ফড়াত করে চার টুকরো করে ফেলল মেসেজটা, ফেলে দিল মাটিতে। বলল, 'রিপোর্ট লেখা দরকার, লিখে নিয়েছি। কিন্তু বাজে কাগজ ছেঁড়ার জন্যে কচুটাও করতে পারবে না কেউ আমার,' বলে নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে, গটমট করে চলে গেল ঘরের দিকে।

ছুটি

'আস্ত ইতর!' লোকটা শুনল কিনা, কেয়ারই করল না জিনা। 'এমন করল কেন?'

'লোকটাকেও দোষ দিতে পারি না,' কাগজের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে মুসা, সেদিকে চেয়ে বলল কিশোর। 'যা একখান গল্প এসে বলেছি, বিশ্বাস করবে কি? ওর জায়গায় আমি হলেও করতে চাইতাম না। এদিকের গাঁয়ের লোক এমনিতেই বানিয়ে কথা বলার ওস্তাদ।'

'তবে একটা সুখবর দিয়েছে,' রবিন বলল। 'কয়েদী ধরা পড়েছে। ডাকাতটা ছাড়া থাকলে বনেবাদাড়ে ঘুরে শান্তি পেতাম না, মন খচখচ করতই।'

'ভাবতে হবে,' কিশোর বলল। 'তবে আগে খাবার ব্যবস্থা করা দরকার। এখানে অনেক ফার্মহাউস আছে, দেখা যায়।'

গ্রামরক্ষীর বাড়ির কাছ থেকে সরে এল ওরা। ছোট একটা মেয়েকে দেখে জিজ্ঞেস করল, এমন কোন ফার্মহাউস আছে কিনা, যেখানে খাবার কেনা যায়।

'ওই তো, পাহাড়ের মাথায় একটা,' হাত তুলে দেখাল মেয়েটা। 'আমার দাদুর বাড়ি। দাদী খুব ভাল, গিয়ে চাইলেই পাবে।'

'থ্যাংকস,' বলল কিশোর।

ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে পথ। বাড়ির কাছাকাছি হতেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠের রোম খাড়া হয়ে গেল রাফিয়ানের, চাপা গোঁ গোঁ করে উঠল।

'চুপ, রাফি,' মাথায় আলতো চাপড় দিল জিনা। 'খাবারের জন্যে এসেছি এখানে। ওদের সঙ্গে গোলমাল করবি না।'

বুঝল রাফিয়ান। রোম স্বাভাবিক হয়ে গেল আবার, গোঁ গোঁ বন্ধ। রেগে ওঠা কুকুরদুটোর দিকে বন্ধু সুলভ চাহনি দিয়ে তার ফোলা লেজটা ঢুকিয়ে নিল দুই পায়ের ফাঁকে।

'এই, কি চাও?' ডেকে জিজ্ঞেস করল একজন লোক।

'খাবার,' চেঁচিয়ে জবাব দিল কিশোর। 'ছোট একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে বলল এখানে পাওয়া যাবে।'

'দাঁড়াও, মাকে জিজ্ঞেস করি,' বলে বাড়ির দিকে চেয়ে ডাকল লোকটা, 'মা? মা?'

সাংঘাতিক মোটা এক মহিলা বেরিয়ে এলেন, চঞ্চল চোখ, আপেলের মত টুকটুকে গাল।

'খাবার চায়,' ছেলেদের দেখিয়ে বলল লোকটা।

'এসো,' ডাকলেন মহিলা। 'এই চুপ, চুপ,' নিজেদের কুকুরগুলোকে ধমক দিলেন।

দেখতে দেখতে কুকুরদুটোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলল রাফিয়ান। ছোটাছুটি খেলা শুরু করল।

বেশ ভাল খাবার। পেট ভরে খেলো অভিযাত্রীরা। রাফিয়ান তো এত বেশি গিলেছে, নড়তে পারছে না, খালি হাঁসফাঁস করছে।

ওরা খাবার টেবিলে থাকতেই সেই ছোট মেয়েটা এসে ঢুকল। 'হাই,' হাসল সে। 'বলেছিলাম না, আমার দাদী খুব ভাল। আমি নিনা। তোমরা?'

একে একে নাম বলল কিশোর। তারপর বলল, 'ছুটিতে ঘুরতে এসেছি। খুব চমৎকার কিন্তু তোমাদের অঞ্চলটা। কয়েক জায়গায় তো ঘুরলাম, বেশ ভাল লাগল। আচ্ছা, টু-ট্রীজটা কোথায় বলতে পারো?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'আমি জানি না। দাঁড়াও, দাদীকে জিজ্ঞেস করি। দাদী? ও দাদী?'

দরজায় উঁকি দিলেন মহিলা। 'কি?'

'টু-ট্রীজ? খুব সুন্দর জায়গা। এখন অবশ্য নষ্ট হয়ে গেছে। একটা হ্রদের ধারে, জংলা জায়গা। হ্রদটার নাম যে কি···কি···'

'ব্ল্যাক ওয়াটার?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্ল্যাক ওয়াটার। ওখানে যাচ্ছে নাকি? খুব সাবধান। আশেপাশে জঙ্গল, জলা···তো, আর কিছু লাগবে-টাগবে ?'

'আরিব্বাপরে। আরও? না, না,' হাসল কিশোর, 'পেট নিয়ে নড়তে পারছি না। খুব ভাল রেঁধেছেন। বিলটা যদি দেন। আমাদের এখন যেতে হবে।'

বিল আনতে চলে গেলেন মহিলা।

নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কোথায় যেতে হবে? ব্ল্যাক ওয়াটার?'

হ্যাঁ-না কিছুই বলল না কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে আনমনে বলল শুধু, 'কালোপানি।'

সাত

ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ে বলল কিশোর, 'টু-ট্রীজ কতদূরে, সেটা আগে জানা দরকার। সম্ভব হলে আজই যাব, নইলে কাল। বেলা এখনও আছে।'

'কতদূরে সেটা, কি করে জানছি?' বলল মুসা। 'ম্যাপ দেখে বোঝা যাবে?'

'যদি ম্যাপে থাকে। থাকার তো কথা, হ্রদ যখন।'

উপত্যকায় নেমে এল আবার ওরা। রাস্তা থেকে দূরে নির্জন একটা জায়গা দেখে এসে বসল।

ম্যাপ বের করে বিছাল কিশোর।

চারজনেই ঝুঁকে এল ওটার ওপর।

সবার আগে রবিনের চোখে পড়ল। ম্যাপের এক জায়গায় আঙুলের খোঁচা মেরে বলল, 'এই যে, ব্ল্যাক ওয়াটার।···কিন্তু টু-ট্রীজ তো দেখছি না।'

'ধ্বংস হয়ে গেলে সেটা আর ম্যাপে দেখানো হয় না, যদি কোন বিশেষ জায়গা না হয়। যাক, ব্ল্যাক ওয়াটার তো পাওয়া গেল। তো, কি বলো, যাব আজ? কত দূরে, বুঝতে পারছি না।'

'এক কাজ করলে পারি,' জিনা প্রস্তাব দিল। 'পোস্ট অফিসে খোঁজ নিলে পারি, ডাকপিয়নের কাছে। সব জায়গায়ই চিঠি বিলি করে, কোথায় কি আছে, সে-ই

সবচেয়ে ভাল বলতে পারবে।'

সবাই একমত হলো।

সহজেই খুঁজে বের করা গেল পোস্ট অফিস। গাঁয়ের একটা দোকানের এক অংশে অফিস, দোকানদারই একাধারে পোস্ট-মাস্টার থেকে পোস্টম্যান। বৃদ্ধ এক লোক, নাকের চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন ছেলেদের দিকে।

'ব্ল্যাক ওয়াটার?' বললেন তিনি। 'ওখানে যেতে চাও কেন? সুন্দর জায়গা ছিল এককালে, কিন্তু এখন তো নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কি হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পুড়ে গেছে। মালিক তখন ওখানে ছিল না, শুধু দুজন চাকর ছিল। এক রাতে হঠাৎ জ্বলে উঠল বাড়িটা, কেন, কেউ বলতে পারে না। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দমকল যেতে পারেনি, পথ নেই। কোনমতে ঘোড়ার ছোট গাড়ি-টাড়ি যায়।'

'আর ঠিক করা হয়নি, না?'

'না,' মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'বাকি যা ছিল, ওভাবেই পড়ে থাকল। এখন ওটা দাঁড়কাক, পেঁচা আর বুনো জানোয়ারের আড্ডা। অদ্ভুত জায়গা, ভূতের আগুন নাকি দেখা যায়। গিয়েছিলাম একদিন দেখতে। আগুন দেখিনি, তবে হ্রদের কালো পানি দেখেছি। যে রেখেছে, একেবারে ঠিক নাম রেখেছে।'

'কদ্দূর? যেতে কতক্ষণ লাগবে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'ওরকম একটা জায়গায় কেন যেতে চাও? হ্রদের পানিতে গোসল করতে? পারবে না, পারবে না, নামলে জমে যাবে। ভীষণ ঠাণ্ডা।'

'নাম আর বর্ণনা শুনে খুব কৌতূহল হচ্ছে,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'কোনদিক দিয়ে যেতে হয়?'

'এভাবে তো বলা যাবে না। ম্যাপ-ট্যাপ থাকলে দেখে হয়তো···আছে তোমাদের কাছে?'

ম্যাপ ছড়িয়ে বিছাল কিশোর।

কলম দিয়ে এক জায়গায় দাগ দিলেন বৃদ্ধ, একটা লাইন আঁকলেন, 'এখান থেকে শুরু করবে, এখানে,' একটা ক্রস দিলেন, 'জায়গাটা। হুঁশিয়ার, ভয়ানক জলা। এক পা এদিক ওদিক ফেলেছ, হঠাৎ দেখবে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে পাঁকে। তবে হ্যাঁ, প্রকৃতি দেখতে পারবে, এত সুন্দর! হরিণও আছে। ভাল লাগবে তোমাদের।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার,' ম্যাপটা রোল করে নিতে নিতে বলল কিশোর। 'যেতে কত সময় লাগবে?'

'এই ঘণ্টা দুয়েক। আজ আর চেষ্টা কোরো না, বোধহয় সময় পাবে না। অন্ধকারে ওপথে যাওয়া?···মরবে!'

হ্যাঁ-না কিছু বলল না কিশোর। আবার ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'আপনার দোকানে ক্যামপিঙের জিনিসপত্র পাওয়া যাবে? দিনটা তো ভারি সুন্দর গেল, রাতটাও বোধহয় ভালই যাবে। গোটা দুই শতরঞ্জি আর কয়েকটা কম্বলও ভাড়া নিতে চাই।'

অবাক হয়ে গেছে অন্য তিনজন। কিশোর কি করতে চাইছে, বুঝতে পারছে না। হঠাৎ বাইরে রাত কাটানোর মতলব কেন?

উঠে গিয়ে তাক থেকে রবারের বড় দুটো শতরঞ্জি নামিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। আর চারটে পুরানো কম্বল। 'নাও। কিন্তু এই অক্টোবরে ক্যামপিং করবে? ঠাণ্ডায় না মরো।'

'মরব না,' বৃদ্ধকে কথা দিল কিশোর।

চারজনে মিলে জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

বাইরে বেরিয়েই জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কিশোর, কি করবে?'

'এই একটু খোঁজাখুজি করব আরকি,' বলল কিশোর। 'একটা রহস্য যখন পাওয়া গেছে...'

'কিন্তু আমরা এসেছি ছুটি কাটাতে।'

'তাই তো কাটাচ্ছি। রহস্যটা পেয়ে যাওয়ায় সময় আরও ভাল কাটবে।'

কিশোর পাশার এহেন যুক্তির পর আর কিছু বলে লাভ নেই, বুঝে চুপ হয়ে গেল মুসা। অন্য দুজন কিছু বললই না। তর্ক করা স্বভাব নয় রবিনের, আর অ্যাডভেঞ্চার জমে ওঠায় মজাই পাচ্ছে জিনা। সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয়? টু-ট্রীজে কিছু ঘটতে যাচ্ছে?'

'এখনি বলা যাচ্ছে না। গিয়ে দেখি আগে। খাবার কিনে নিয়ে যাব। এখন রওনা দিলে পৌঁছে যাব অন্ধকারের আগেই। ওখানে কোথাও না কোথাও ক্যাম্প করার জায়গা নিশ্চয় মিলবে। সকালে দেখব কোথায় কি আছে।'

'শুনতে তো ভালই লাগছে,' কুকুরটার দিকে ফিরল জিনা। 'কি বলিস, রাফি?'

'হউ,' সমঝদারের ভঙ্গিতে লেজ নেড়ে সায় দিল রাফিয়ান।

'যাচ্ছি তো,' বলল মুসা, 'কিন্তু ধরো, গিয়ে কিছু পেলাম না। তাহলে? এই রহস্য-টহস্যের কথা...'

'আমার ধারণা, পাবই। যদি না পাই, ক্ষতি কি? ঘুরতেই তো বেরিয়েছি আমরা, নাকি? পিকনিকের জন্যে ব্ল্যাক ওয়াটারের মত জায়গা এখানে আর কটা আছে?'

রুটি, মাখন, টিনে ভরা মাংস ও বিশাল একটা ফ্রুট কেক কিনে নিল কিশোর। কিছু চকলেট আর বিস্কুটও নিল।

মালপত্রের বোঝার জন্যে দ্রুত হাঁটা যাচ্ছে না, তবে অতটা তাড়াহুড়াও নেই ওদের। আঁধার নামার আগে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই হলো। দেখতে দেখতে চলেছে।

পাহাড়ের চড়াই-উৎড়াই, সমতল তৃণভূমি, হালকা জঙ্গল, সব কিছু মিলিয়ে এক অপরূপ দৃশ্য। দূরে একদল বুনো ঘোড়া চড়ছে। কয়েকটা চিতল হরিণের মুখোমুখি হলো অভিযাত্রীরা। ক্ষণিকের জন্যে থমকে গেল হরিণগুলো, পরক্ষণেই ঘুরে দে ছুট।

আগে আগে চলেছে কিশোর, খুব সতর্ক, বৃদ্ধ পোস্টম্যানের হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দিয়ে চলেছে সারাক্ষণ। বার বার ম্যাপ দেখে শিওর হয়ে নিচ্ছে, ঠিক পথেই রয়েছে কিনা।

পাটে বসছে টকটকে লাল সূর্য। ডুবে গেলেই ধড়াস করে নামবে অন্ধকার, এখানকার নিয়মই এই। তবে ভরসা, আকাশ পরিষ্কার, আর শরতের আকাশে

তারাও হয় খুব উজ্জ্বল, তারার আলোয় পথ দেখে চলা যাবে। তবু তাড়াহুড়ো করল ওরা, দিনের আলো থাকতে থাকতেই পৌঁছে যেতে পারলে ভাল, দুর্গম পথে অযথা ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না।

ছোট একটা সমভূমি পেরিয়ে সামনে দেখাল কিশোর, 'জঙ্গল। বোধহয় ওটাই।'

'হ্রদ কোথায়?' বলল রবিন। 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে। কালো।'

কি করে যেন বুঝে গেছে রাফিয়ান, গন্তব্য এসে গেছে। লেজ তুলে সোজা সেদিকে দিল দৌড়। ডেকেও ফেরানো গেল না। তার কাণ্ড দেখে সবাই হেসে অস্থির।

আঁকাবাঁকা পথটা গিয়ে মিশেছে আরেকটা সরু পথের সঙ্গে, তাতে ঘোড়ার গাড়ির চাকার গভীর খাঁজ। দু-ধারের ঘন আগাছা পথের ওপরও তাদের রাজ্য বিস্তৃত করে নিয়েছে।

জঙ্গলে ঢুকল ওরা। বন কেটে এককালে করা হয়েছিল পথটা, মানুষের অযত্ন অবহেলায় বন আবার তার পুরানো স্বত্ব দখল করে নিচ্ছে।

'আমি আসছি,' ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে অন্ধকার।

ঠিক এই সময় হঠাৎ করেই টু-ট্রীজের ধ্বংসাবশেষের ওপর এসে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা।

কালো, নির্জন, নিঃসঙ্গ, পোড়া ধ্বংসস্তূপ। ভাঙা দু-একটা ঘর এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, জানালার পাল্লা আছে, কাচ নেই, ছাতের কিছু কড়িবর্গা আছে, কিন্তু ছাত নেই। মানুষের সাড়া পেয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উড়ে গেল দুটো দোয়েল।

বাড়িটা কালো হ্রদের ঠিক পাড়েই। নিথর, নিস্তব্ধ পানি, সামান্যতম ঢেউ নেই। যেন কালো জমাট বরফ···না না, কালো বিশাল এক আয়না।

'মোটেই ভাল্লাগছে না আমার,' নাকমুখ কোঁচকাল মুসা। 'কেন যে এলাম মরতে।'

আট

কারোই পছন্দ হলো না জায়গাটা। নীরবে হাত তুলে দেখাল কিশোর। মূল বাড়িটা যেখানে ছিল তার দু-ধারে বিশাল দুটো গাছের পোড়া কাণ্ড।

'ওই গাছগুলোর জন্যেই নিশ্চয় নাম রেখেছে টু-ট্রীজ,' বলল সে। 'এতটা নির্জন হবে, ভাবিনি।'

'নির্জন কি বলছ?' বলে উঠল মুসা। 'রীতিমত ভূতুড়ে। গা ছমছম করে।'

সূর্য ডোবার অপেক্ষায়ই যেন ছিল কনকনে ঠাণ্ডা। ফিসফিসিয়ে কানাকানি করে গেল এক ঝলক বাতাস, হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল অভিযাত্রীদের।

'এসো,' জরুরী কণ্ঠে বলল কিশোর, 'রাত কাটানোর জায়গা খোঁজা দরকার।'

বিষণ্ণ বাড়িটায় নীরবে ঢুকল ওরা। দোতলার কিছুই অবশিষ্ট নেই। নিচতলার অবস্থাও শোচনীয়। তবে এক কোণে শোয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কালো

ছাইতে মাখামাখি আধপোড়া একটা কার্পেট এখনও বিছানো রয়েছে মেঝেতে, বিরাট একটা টেবিলও আছে।

'বৃষ্টি এলে ওটাতে উঠে বসতে পারব,' টেবিলটা দেখিয়ে বলল কিশোর। 'তবে দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

'একেবারেই বাজে জায়গা,' রবিনও মুখ বাঁকাল। 'গন্ধ! থাকা যাবে না এখানে।'

'অন্য জায়গা খোঁজা দরকার,' কিশোর বলল। 'অন্ধকারও হয়ে এসেছে। আগে লাকড়ি নিয়ে আসি, আগুনের ব্যবস্থা করে, তারপর...'

জিনাকে রেখে লাকড়ি আনতে বেরোল অন্য তিনজন। শুকনো ডালের অভাব নেই। তিন আঁটি লাকড়ি নিয়ে ফিরে এল ওরা।

জিনা বসে থাকেনি। থাকার জন্যে আরেকটা জায়গা খুঁজে বের করে ফেলেছে, প্রথমটার চেয়ে ভাল।

ছেলেদের দেখাতে নিয়ে চলল সে। রান্নাঘরের এক ধারে মেঝেতে একটা দরজা, পাল্লা তুলে রেখেছে জিনা, নিচে ধাপে ধাপে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে।

'ভাঁড়ারে গিয়েছে,' সিঁড়ি দেখিয়ে বলল জিনা।

'ঢুকেছিলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, অনুমান। নিচে নিশ্চয় আগুন ঢুকতে পারেনি, ছাই থাকবে না। ওপরের ঘরের চেয়ে ওখানে ভাল হবে। থাকতে পারব।'

টর্চ জ্বেলে নামতে শুরু করল কিশোর, পেছনে অন্যেরা। রাফিয়ান চলেছে তার পাশে পাশে।

কয়েক সিঁড়ি বাকি থাকতেই এক লাফে গিয়ে মেঝেতে নামল কুকুরটা। ওপরেরটার চেয়ে অনেক ভাল ঘর। বিদ্যুতের তার, বোর্ড, সকেট, সুইচ সবই লাগানো আছে। জেনারেটর ছিল, বোঝাই যায়।

ছোট ঘর। মেঝেতে পোকায় খাওয়া কার্পেট। ঘুণে ধরা আসবাবপত্রে ধুলোর পুরু আস্তরণ। ভাঁড়ার-কাম-বসার ঘর ছিল এটা। সারাঘরে মাকড়সার জাল, গালে লাগতেই থাবা দিয়ে সরাল জিনা।

তাকে কিছু মোমবাতি পাওয়া গেল। ভালই হলো। অন্ধকারে থাকতে হবে না।

লাকড়ি এনে ঘরের কোণে জড়ো করে রাখা হলো।

আসবাবগুলো কোন কাজের নয়। ঘুণে খেয়ে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। একটা চেয়ারে গিয়ে বসেছিল মুসা, মড়মড় করে ভেঙে পড়ল ওটা। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে চিতপটাং হলো গোয়েন্দা-সহকারী। হেসে উঠল সবাই।

তবে টেবিলটা মোটামুটি ঠিকই আছে। ধুলো পরিষ্কার করে ওটার ওপর রাখা হলো খাবারের প্যাকেট।

বাইরে অন্ধকার। চাঁদ ওঠেনি। শরতের শুকনো পাতায় মর্মর তুলে ঘুরেফিরে বইছে বাতাস, কিন্তু কালো হ্রদটা আগের মতই নিথর। ছলছলাৎ করে তীরে আছড়ে পড়ছে না ঢেউ।

ছুটি

ভাঁড়ারে আলমারিও আছে একটা। খুলে দেখল কিশোর। 'আরও মোমবাতি, বাহ্, চমৎকার। প্লেট···কাপ···এই, কুয়া-টুয়া চোখে পড়েছে কারও? খাবার পানি লাগবে।'

না, কুয়া দেখেনি কেউ। তবে রবিন একটা জিনিস দেখেছে, ওপরে রান্নাঘরের এক কোণে, সিংকের কাছে। 'বোধহয় পাম্প,' বলল সে। 'চলো দেখি, ঠিক আছে কিনা।'

মোমবাতি জ্বেলে ওপরে উঠে এল সবাই। ঠিকই বলেছে রবিন। পাম্প-ই। ট্যাংকে পানি তোলা হত হয়তো। বড় সিংকের ওপরে কলও আছে, ট্যাংক থেকেই পানি আসত।

হাতল ধরে ঠেলে জোরে জোরে পাম্প করল রবিন। কলের মুখ দিয়ে তোড়ে বেরিয়ে এল পানি, ভিজিয়ে দিল বহুদিনের শুকনো সিংক।

রবিনকে সরিয়ে হাতল ধরল মুসা। পাম্প করে চলল। অনেক বছর পর আবার পানি উঠছে ট্যাংকে। ধুলো-ময়লা আর মরচে মিশে কালচে-লাল হয়ে কলের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে পানি। ধুয়ে পরিষ্কার হতে সময় লাগবে।

একনাগাড়ে পাম্প করে চলেছে মুসা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে পানি।

একটা কাপ ধুয়ে পানি নিল তাতে কিশোর। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি, লালচে রঙ রয়েছে সামান্য, তবে সেটা কেটে গেলে স্ফটিকের মত হয়ে যাবে। চুমুক দিয়ে দেখল। 'আহ্, দারুণ। এক্কেবারে যেন ফ্রিজের পানি।'

থাকার চমৎকার জায়গা পাওয়া গেছে, খাবার পানি মিলেছে, আর খাবার তো সঙ্গে করে নিয়েই এসেছে। মোমবাতি আর লাকড়ি আছে প্রচুর। আর কি চাই? বিছানা পেতে আরাম করে জাঁকিয়ে বসল ওরা।

'খিদে পেয়েছে কারও?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'এই মুসা, খাবে?'

'আমারই পেয়েছে, আর ওর পাবে না?' হেসে বলল জিনা।

কিছু রুটি, মাখন আর এক টিন গোশত খুলে নিয়ে বসল ওরা। খেতে খেতেই আলাপ-আলোচনা চলল, আগামীদিন কি কি করবে।

'কি খুঁজছি আসলে আমরা?' জানতে চাইল রবিন। 'কিছু লুকানো-টুকানো আছে ভাবছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'কি আছে, তা-ও বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি।'

'কী?' একই সঙ্গে প্রশ্ন করল তিনজন।

'ধরি, দলের নেতা জেরি। সে রয়েছে জেলে। তার যে বন্ধু পালিয়েছিল, তার কাছে একটা মেসেজ দিয়েছে অন্য দুই বন্ধু বা সহকারীকে দেয়ার জন্যে। সেই দুজনের একজন হলো ডারটি রবিন, অন্যজন টিকসি।'

'ধরা যাক, বেশ বড় ধরনের একটা ডাকাতি করেছে জেরি,' একে একে তিনজনের মুখের দিকে তাকাল কিশোর, আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছে ওরা। রাফিয়ানও যেন গভীর আগ্রহে শুনছে, এমনি ভাবসাব, জিনার গা ঘেঁষে রয়েছে। 'কি

ডাকাতি করেছে, জানি না, তবে সম্ভবত গহনা। টাকাও হতে পারে। সেগুলো লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে এলে তারপর বের করবে। যে কারণেই হোক, ডাকাতির পর পরই ধরা পড়ে কয়েক বছরের জন্যে জেলে গেছে সে। ডাকাতির মাল কোথায় রেখেছে, কিছুতেই বলেনি পুলিশকে। কিন্তু পুলিশ ছাড়বে কেন? যেভাবেই হোক, কয়েদীর মুখ থেকে কথা আদায় করবেই। সেটা বুঝতে পেরেছে জেরি। কি করবে সে-ক্ষেত্রে?'

'জেল-পালানো বন্ধুর কাছে মেসেজ দিয়ে দেবে,' বলল রবিন, 'অন্য দুই সহকারীকে জানানোর জন্যে, চোরাই মাল কোথায় আছে। পুলিশ আসার আগেই ওগুলো বের করে নিয়ে চম্পট দেবে ওরা।'

'ঠিক তাই,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'তাহলে ডাকাতদের আগে আমরা খুঁজে বের করব মালগুলো,' জ্বলজ্বল করছে জিনার চোখ। 'কাল ভোরে উঠেই খোঁজা শুরু করব।'

'হুঁ, তাহলে মেসেজের কোড বুঝতে হবে আগে,' বলল মুসা। 'টু-ট্রীজ আর ব্ল্যাক ওয়াটার তো বুঝলাম। কিন্তু ওয়াটার মেয়ার?'

'জলঘোটকী,' বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর।

'কি বললে?'

'অ্যাঁ···জলঘোটকী, মানে পানির ঘোড়া। বোট···এই কোন নৌকা বা লঞ্চ।'

'ঠিক বলেছ,' তর্জনী দিয়ে জোরে বাতাস কোপাল জিনা। 'যে জন্যে হ্রদ, সে জন্যে নৌকা। গোসলই যদি না করল, সাঁতার না কাটল আর নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে না গেল, তাহলে এতবড় হ্রদের ধারে কেন বাড়ি করতে যাবে লোকে? নিশ্চয় একটা বোট আছে কোথাও, তাতে চোরাই মাল লুকিয়েছে ব্যাটারা।'

'কিন্তু অতি সহজে রহস্য ভেদ হয়ে গেল না?' সন্দেহ যাচ্ছে না রবিনের। 'একটা বোটে চোরাই মাল লুকাবে···যে কেউ দেখে ফেলতে পারে বোটটা··· তাছাড়া, মেসেজ লেখা কাগজটায় আঁকিবুঁকিগুলো কিসের?'

'মুসা,' হাত বাড়াল কিশোর, 'নকশাটা দেখি?'

পকেট থেকে চার টুকরো ছেঁড়া কাগজ বের করে দিল মুসা।

হাসি মুখে ব্যাগ খুলে এক রোল টেপ বের করে দিল জিনা। 'নাও, কাজে লেগেই গেল। মনে হয়েছিল লাগতে পারে, তাই নিয়েছিলাম।'

'কাজের কাজ করেছ একটা,' কিশোরও হাসল।

টেপ দিয়ে জুড়ে চার টুকরো কাগজ আবার এক করে ফেলা হলো।

'এই যে দেখো,' নকশায় আঙুল রাখল কিশোর,' এখানে চারটে লাইন মিশেছে। প্রত্যেকটা লাইনের শেষ মাথায় লেখা···এত অস্পষ্ট করে লিখেছে···' নুয়ে ভালমত দেখে একটা পড়ল সে, 'টক হিল।···এটা, স্টীপল···'

'আর এটা চিমনী,' রবিন পড়ল তৃতীয় শব্দটা।

'আর এটা হলো টল স্টোন,' চতুর্থটা পড়ল জিনা।

'দিল মাথা গরম করে,' হাত ওল্টাল মুসা। 'বলি, মানে কি এগুলোর?'

'কিছু তো একটা নিশ্চয়,' বলল কিশোর। 'শব্দগুলো মাথায় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

সকাল নাগাদ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।'

নয়

নকশাটা সাবধানে ভাঁজ করে নিজের কাছে রেখে দিল কিশোর।

'আরেকটা অংশ কিন্তু আছে টিকসির কাছে,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'সেটা ছাড়া সমাধান হবে?'

'হতেও পারে,' বলল কিশোর। 'হয়তো তার কাছেও এটারই আরেক কপি পাঠানো হয়েছে।'

'তাহলে তো সে-ও খুঁজতে আসবে এখানে,' বলল জিনা।

'এলে আসবে,' মুসা বলল। 'লুকিয়ে থাকব।'

'তারও দরকার নেই,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমাদের কাছে নকশা আছে জানছে কি করে? দেখে ফেললে বলব, ছুটিতে বেড়াতে এসেছি।'

'তারপর চোখ রাখব তার ওপর,' হাসল রবিন। 'বেটি অস্বস্তি বোধ করবে না?'

'করলে করুক, আমাদের কি...' কথা শেষ না করেই চুপ হয়ে গেল মুসা, কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে।

গম্ভীর হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান। চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'টিকসি একা আসবে বলে মনে হয় না। হয়তো ডারটিকে নিয়েই আসবে। ডারটির কাছে মেসেজ নেই তো কি হয়েছে? টিকসির কাছে আছে। একই মেসেজ হলে ওই একটাতেই চলবে। ডারটি যদি ওদের সহকারী হয়, কিছুতেই তাকে ফেলে আসবে না টিকসি।'

'হ্যাঁ, তাই তো,' মাথা দোলাল রবিন। 'আর ডারটি মেসেজ পায়নি শুনলে সন্দেহ জাগবে। হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।'

'তার মানে যতটা সহজ মনে হয়েছিল,' হাই তুলতে তুলতে বলল রবিন, 'তত সহজ নয় ব্যাপারটা...এহ্, বড্ড ঘুম পেয়েছে। যাই, শুয়ে পড়ি।'

মুসাও হাই তুলল। 'আমিও যাই।'

যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ল মুসা আর রবিন। ওদের কাছ থেকে দূরে ঘরের এক কোণে বিছানা পাতল জিনা। শুয়ে পড়ল। তার পায়ের কাছে রাফিয়ান।

একটা রেখে বাকি মোমগুলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল কিশোরও।

দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল চারজনেই।

লম্বা হয়ে শুয়ে আছে রাফিয়ান, চোখ বন্ধ, কিন্তু কান খাড়া। সামান্যতম শব্দ হলেই নড়েচড়ে উঠছে।

একবার মৃদু একটা শব্দ হতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকল, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির কাছে। একটা ফাটলে নাক নিয়ে গিয়ে শুঁকল, পরক্ষণেই শান্ত হয়ে ফিরে এল আগের জায়গায়। সাধারণ একটা ব্যাঙ।

মাঝরাতের দিকে আবার মাথা তুলল সে। ওপরে রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠে এল ওপরে। চাঁদের আলোয় পান্নার মত জ্বলে উঠল তার

সবুজ চোখ।

দ্রুত চলে যাচ্ছে একটা জানোয়ার। রোমশ মোটা লেজ। শেয়াল। কুকুরের গন্ধ পেয়েই পালাচ্ছে।

সিঁড়ির মুখে অনেকক্ষণ বসে বসে পাহারা দিল রাফিয়ান। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল আবার।

গলে গলে শেষ হয়ে গেছে মোমটা। ঘর অন্ধকার। অঘোরে ঘুমোচ্ছে সবাই। জিনার পায়ের কাছে এসে আবার শুয়ে পড়ল সে।

সবার আগে ঘুম ভাঙল কিশোরের। শক্ত মেঝেতে শুয়ে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে। চোখ মেলে প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় আছে, আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল। সবাইকে ডেকে তুলল সে।

তাড়াহুড়ো করে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা সেরে নিল সবাই। অনেক কাজ পড়ে আছে।

হ্রদের দিকে চলে গেছে একটা সরু পথ। দুই ধারে নিচু দেয়াল ছিল এক সময়, এখন ধসে পড়েছে। শেওলায় ঢেকে গেছে ইঁট। পথ ঢেকে দিয়েছে লতার জঙ্গল, মাঝে মাঝে ছোট ঝোপঝাড়ও আছে। পথের অতি সামান্যই চোখে পড়ে।

তেমনি নিথর হয়ে আছে কালো হ্রদটা। তবে তাতে প্রাণের সাড়া দেখা যাচ্ছে এখন। ওদের দেখে কঁক করে পানিতে ডুব দিল একটা জলমুরগী।

'বোটহাউসটা কোথায়?' আনমনে বলল মুসা। 'আছে না নেই, তাই বা কে জানে।'

হ্রদের ধারের পথ ধরে দ্রুত পা চালানোর চেষ্টা করছে ওরা, পারছে না। নানা রকম বাধা। লতা, ঝোপঝাড় যেন একেবারে পানির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠে এসেছে ডাঙায়। বোটহাউস চোখে পড়ছে না।

এক জায়গায় হ্রদ থেকে একটা খাল বেরিয়ে ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে।

'মানুষের কাটা খাল,' বলল কিশোর। 'নিশ্চয় বোটহাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

খালের পাড় ধরে এগোল ওরা। খানিক পরেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ওই যে! লাতাপাতায় এমন ঢেকে গেছে, বোঝাই যায় না।' হাত তুলে দেখাল সে।

দেখল সবাই। সরু হতে হতে এক জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে খাল। ঠিক সেখানে খালের ওপর নেমে গেছে সরু লম্বা একটা বাড়ি। লতাপাতা ঝোপঝাড়ে এমন ঢেকে ফেলেছে, ভালমত না দেখলে ঠাহরই করা যায় না, ওখানে কোন বাড়িঘর আছে।

'মনে হয় ওটাই,' খুশি হয়ে উঠেছে মুসা। 'ওয়াটার মেয়ারকে পেলে হয় এখন।'

বৈঁচি আর এক জাতের কাঁটা-গাছই বেশি। ওগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে এগোতে গিয়ে কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে শরীর, কিন্তু উত্তেজনায় খেয়ালই করছে না ওরা।

ছুটি

বাড়ির সামনেটা পানির দিকে, ওটাই সদর। একটা চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে পানির ধার থেকে।

ওখান দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু পা রাখতেই ভেঙে পড়ল পচা তক্তা। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। না, হবে না এদিক দিয়ে। অন্য পথ খুঁজতে হবে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর কোন পথ পাওয়া গেল না।

পুরো বাড়িটাই কাঠ দিয়ে তৈরি। শেওলা জমে রয়েছে সবখানে। এক জায়গায় দেয়ালের তক্তা পচে কালো হয়ে গেছে।

লাথি মারল মুসা। জুতোশুদ্ধ পা ঢুকে গেল পচা কাঠে।

চারজনে মিলে সহজেই দেয়ালের তক্তা ভেঙে বড় একটা ফোকর করে ফেলল। আগে ঢুকল কিশোর। অন্ধকার। বাতাসে কাঠ আর পচা লতাপাতার ভেজা দুর্গন্ধ।

চওড়া সিঁড়িটার মাথায় এসে দাঁড়াল সে। নিচে কালো অন্ধকার পানি, একটা ঢেউও নেই। ফিরে ডাকল, 'এসো, দেখে যাও।'

সিঁড়ির মাথায় এসে নিচে তাকাল সবাই। আবছা অন্ধকার। নৌকা রাখার ছাউনি এটা—বোটহাউস। পানির দিকে মুখ, কিন্তু এখন পুরোপুরি খোলা নেই। আগাছা আর লতা অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে। ছাত থেকে ঝুলছে লতা, নিচের পানির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠেছে জলজ আগাছা, এরই ফাঁক দিয়ে যতখানি আলো আসতে পারছে, আসছে। তবে অন্ধকার তাতে কাটছে না বিশেষ।

চোখে সয়ে এল আবছা অন্ধকার। দেখতে পাচ্ছে এখন।

'ওই যে নৌকা!' নিচের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'খুঁটিতে বাঁধা। ওই তো, আমাদের ঠিক নিচেই একটা।'

মোট তিনটে নৌকা। দুটো অর্ধেক ডুবে রয়েছে পানিতে, দুটোরই গলুই পানির নিচে।

'তলা ফুটো হয়ে গেছে বোধহয়,' ঝুঁকে নিচে চেয়ে আছে কিশোর। কোমরের বেল্ট থেকে টর্চ খুলে নিয়ে জ্বালল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আলো ফেলে দেখল বোটহাউসের ভেতরে।

দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে অনেকগুলো দাঁড়। কতগুলো কালচে থকথকে নরম জিনিস রয়েছে কয়েকটা তাকে, পাটাতনে ফেলে বসার গদি, পচে নষ্ট হয়ে গেছে। এক কোণে একটা নোঙর পড়ে আছে। দড়ির বাণ্ডিল সাজানো রয়েছে একটা তাকে। বিষণ্ণ পরিবেশ। কথা বললেই বিচ্ছিরি প্রতিধ্বনি উঠছে।

পরিত্যক্ত বোটহাউস ভূতের বাসা—মনে পড়ে গেল মুসার। ভয়ে ভয়ে তাকাল চারদিকে। সে-ও টর্চ খুলে নিল। আলো জ্বেলে ভূত তাড়ানোর ইচ্ছে। নিচু গলায় বলল, 'ওয়াটার মেয়ার কোনটা?'

'ওই যে,' একটা নৌকার গলুইয়ের কাছে আলো ফেলে বলল কিশোর, 'ওয়াটার কি যেন?' কয়েক ধাপ নামল সে। 'ও, ওয়াটার লিলি।'

আরেকটা নৌকার গলুইয়ের কাছে আলো ফেলল মুসা।

'অকটোপাস,' বলে উঠল রবিন।

'বাহ্, চমৎকার,' বলল মুসা। 'একটার নাম ওয়াটার লিলি, আরেকটা একেবারে অকটোপাস। মালিকের মাথায় দোষ ছিল।'

'আর ওই যে, ওটার কি নাম?' তৃতীয় নৌকাটা দেখাল জিনা। 'ওটাই ওয়াটার মেয়ার?'

দুটো টর্চের আলো এক সঙ্গে পড়ল নৌকাটার গলুইয়ের কাছে। শুধু 'এম' অক্ষরটা পড়া যাচ্ছে। সাবধানে আরও নিচে নামল কিশোর। তক্তা ভেঙে পানিতে পড়ার ভয় আছে। রুমাল ভিজিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করল নামের জায়গাটা।

'হুঁ,' বিড়বিড় করল কিশোর, 'অকটোপাস, লিটল মারমেইড, ওয়াটার লিলি···অকটোপাস, জলকুমারী, জলপদ্ম···শিওর, জলঘোটকীও এই পরিবারেরই মেয়ে···'

'অকটোপাসটা ছেলে, না?' বলল মুসা।

'কি জানি,' হাত ওল্টাল কিশোর। 'ওটার মালিকই জানে।'

'কিন্তু ওয়াটার মেয়ারটা কোথায়?' জিনার প্রশ্ন।

'পানিতে ওদিকে কোথাও ডুবে আছে?' বোটহাউসের মুখের দিকে দেখাল মুসা।

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'দেখছ না, পানি কম? ডুবে থাকলেও দেখা যেত। তলার বালি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।'

তবু, আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আলো ফেলে দেখল পানির যতখানি চোখে পড়ে। আর কোন নৌকা নেই এখানে।

'গেল কোথায় জলঘোটকী,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। 'কখন? কিভাবে? কেন?'

বোটহাউসের ভেতরটা আরেকবার ভালমত দেখল ওরা। সিঁড়ির কাছে, বোটহাউসের এক পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়েছে কাঠের বড় একটা জিনিস।

'কি ওটা?' জিনা বলল। 'ওহহো, ভেলা।'

কাছে গিয়ে ভেলাটা ভাল করে দেখল সবাই।

'বেশ ভাল অবস্থায়ই আছে,' ভেলার গায়ে হাত বোলাল কিশোর। 'ইচ্ছে করলে আমরা পাঁচজনেই চড়তে পারব এটাতে।'

'দারুণ মজা হবে,' আনন্দে হাত তালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল জিনা। 'ভেলায় চড়তে যা ভাল্লাগে না আমার। নৌকার চেয়েও মজার।'

'নৌকাও একটা আছে অবশ্য,' কিছু ভাবছে কিশোর। 'ইচ্ছে করলে ওটাতেও চড়া যায়।'

'আচ্ছা, তিনটে নৌকাই খুঁজে দেখলে হয় না?' প্রস্তাব দিল মুসা। 'লুটের মাল আছে কিনা?'

'দরকার নেই,' বলল কিশোর। 'তাহলে জলঘোটকীর নাম থাকত না মেসেজে। তোমার সন্দেহ থাকলে গিয়ে খুঁজে দেখতে পারো।'

ছুটি

কিশোর পাশা যখন বলছে নেই, থাকবে না।

'এক কাজ করো,' আবার বলল কিশোর। 'সন্দেহ যখন হয়েছে, গিয়ে খুঁজে দেখো। এসব ব্যাপারে হেলাফেলা করা উচিত নয়। শিওর হয়েই যাই।'

'কিন্তু ওয়াটার মেয়ার গেল কোথায়?' বলল সে। 'পরিবারের সবাই এখানে হাজির, আরেকটা গিয়ে লুকাল কোথায়? হ্রদের তীরে কোথাও লুকানো হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে,' ভেলাটা ঠেলছে কিশোর, থেমে গেল। 'ডাঙায় না হোক, পাড়ের নিচে কোথাও কোন গলিঘুপচিতে লুকিয়ে রেখেছে হয়তো।'

'চলো না তাহলে, এখনি খুঁজে দেখি,' ভেলায় চড়ার লোভ আপাতত চাপা দিল জিনা।

দেয়ালের ভাঙা ফোকর দিয়ে আবার বাইরে বেরোল ওরা। বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস। বোটহাউসের দুর্গন্ধ থেকে দূরে আসতে পেরে হাঁপ ছেড়েছে। সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে রাফিয়ান। অন্ধকার ওই ঘরটা মোটেও ভাল লাগছিল না তার। এই তো, কি চমৎকার উষ্ণ রোদ, কি আরামের বাতাস, লেজের রোম কি সুন্দর ফুলিয়ে দেয় ফুঁ দিয়ে।

'কোনদিক থেকে শুরু করব?' বলল রবিন । 'ডান, না বাম?'

নীরবে পানির ধারে এগিয়ে গেল কিশোর, পেছনে অন্যেরা। ডানেও তাকাল, বাঁয়েও। কিন্তু কোন দিকেই কোন পার্থক্য নেই, দু-দিকেই সমান ঘন ঝোপঝাড়।

'পানির কাছাকাছি থাকাই মুশকিল,' বলল কিশোর। 'দেখা যাক তবু। চলো, বাঁ দিক থেকেই শুরু করি।'

শুরুতে জঙ্গল তেমন ঘন নয়, পানির কাছাকাছি থাকা গেল। পানির ওপর ঝুঁকে রয়েছে লতানো ঝোপ, যে কোনটার তলায় লুকিয়ে রাখা যায় নৌকা। উঁকি দিয়ে, পাড়ের নিচে নেমে, যতভাবে সম্ভব, নৌকা আছে কিনা দেখার চেষ্টা করল ওরা।

সিকি মাইল পর থেকেই ঘন হতে শুরু করল জঙ্গল। এত ঘন যে পথ করে এগোনোই কঠিন, থাক তো পানির ধারে গিয়ে উঁকি দেয়া। পানির ধারে মাটি রসাল বলেই বোধহয়, জঙ্গল ওখানে আরও বেশি ঘন।

'নাহ্, এভাবে হবে না,' এক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'যা কাঁটা। শেষে চামড়া নিয়ে ফিরতে পারব না।'

'হ্যাঁ, কাঁটা বেশিই,' দুই হাতের তালু দেখছে মুসা, কেটে ছড়ে গেছে, কোন আঁচড়, এত গভীর, রক্ত বেরোচ্ছে। 'ঠিকই বলেছ, এভাবে হবে না।'

অন্য দুজনেরও একই অভিমত। আনন্দ পাচ্ছে শুধু রাফিয়ান। বার বার উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে বনের দিকে। বুঝতে পারছে না যেন, এত সুন্দর কাঁটা আর ঝোপকে কেন পছন্দ করছে না বোকা ছেলে-মেয়েগুলো?

ছেলেরা যখন ফিরল, রীতিমত আহত বোধ করল রাফিয়ান। হতাশ ভঙ্গিতে হেঁটে চলল ওদের পেছনে।

'ডানে চেষ্টা করে দেখব নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'নাহ্ লাভ হবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ওদিকে আরও বেশি জঙ্গল। খামোকা সময় নষ্ট। তার চেয়ে এক কাজ করি এসো?...ভেলায় চড়ে ঘুরি?'

'ঠিক বলেছ। দারুণ হবে,' সঙ্গে সঙ্গে বলল জিনা। 'কষ্টও হবে না, তাছাড়া পানির দিক থেকে দেখার সুবিধে অনেক। কোন ঘুপচিই চোখ এড়াবে না। সহজেই খুঁজতে পারব।'

'ইস্, আগে মনে পড়ল না কেন?' আফসোস করল মুসা। 'তাহলে তো এভাবে হাত-পাগুলো ছুলতে হত না।'

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আবার বোটহাউসের দিকে রওনা হলো ওরা।

হঠাৎ থেমে গেল রাফিয়ান। চাপা গর্জন করে উঠল।

'কি হয়েছে, রাফি?' থেমে গিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল জিনা।

আবার গোঁ গোঁ করে উঠল রাফিয়ান।

সাবধানে পিছিয়ে গেল চারজনে। একটা ঝোপের ভেতর থেকে মাথা বের করে তাকাল বোটহাউসের দিকে। কই, কিছুই তো নেই? এমন করছে কেন তাহলে রাফিয়ান?

সবার আগে দেখল মুসা। কিশোরের পাঁজরে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল।

এক তরুণী, আর একটা লোক। কথা বলছে।

'নিশ্চয় টিকসি,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'আর ওই ব্যাটা ডারটি রবিন,' মুসা বলল, 'আমি শিওর।'

দশ

ওই দুজন আসবে, জানাই আছে ছেলেদের, তাই চমকাল না।

ডারটিকে চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি মুসার। রাতে দেখেছে, সকালেও দেখেছে—চওড়া কাঁধ, সোজা হয়ে দাঁড়ালে সামান্য কুঁজো মনে হয়, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। তবে, তার বাড়িতে তাকে যেমন লেগেছিল, এখন ঠিক ততটা ভীষণ মনে হচ্ছে না।

তবে মেয়েমানুষটাকে কেউই পছন্দ করতে পারছে না, একটুও না। পরনে ডোরাকাটা প্যান্ট, গায়ে রঙিন শার্টের ওপর আঁটসাঁট জ্যাকেট, চোখে বেমানান রকমের বড় সানগ্লাস, দাঁতের ফাঁকে চুরুট। ওর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, তীক্ষ্ণ স্বর।

'ও-বেটিই তাহলে টিকসি,' ভাবল কিশোর। 'জেরি ডাকাতকে দেখিনি, তবে ভালই সঙ্গিনী জুটিয়েছে ডাকাতটা।'

সঙ্গীদের দিকে ফিরল গোয়েন্দাপ্রধান। রাফিয়ানের গলার বেল্ট টেনে ধরে রেখেছে জিনা, বেরোতে দিচ্ছে না। 'শোনো,' কিশোর বলল, 'ওদেরকে না চেনার ভান করবে। কথা বলতে বলতে বেরোব আমরা, যেন জঙ্গল দেখতে ঢুকেছিলাম। যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, বলবে বেড়াতে এসেছি। উল্টো-পাল্টা যা খুশি বলবে। বোঝাব, আমরা মাথামোটা একদল ছেলে-মেয়ে, স্রেফ ছুটি কাটাতে এসেছি। আর বেকায়দা কোন প্রশ্ন যদি করে, চুপ করে থাকবে, আমি জবাব দেব। ও-কে?'

মাথা ঝাঁকাল তিনজনেই।

ঝোপের ভেতর থেকে বেরোল কিশোর হুড়মুড় করে। ডাকল, 'মুসা, এসো।

ওই যে, বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। মাই গড, সকালের চেয়েও খারাপ দেখাচ্ছে এখন।'

জিনা আর রাফিয়ান একসঙ্গে লাফিয়ে বেরোল, তাদের পেছনে এল রবিন।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল দুই ডাকাত। দ্রুত কি যেন বলল একে অন্যকে। ভুরু কুঁচকে তাকাল লোকটা।

বকবক করতে করতে ওদের দিকে এগোল ছেলেরা।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেয়েমানুষটা, 'কে তোমরা? এখানে কি করছ?'

'বেড়াতে এসেছি,' জবাব দিল কিশোর। 'ঘোরাফেরা করছি। স্কুল ছুটি।'

'এখানে কেন এসেছ? এটা প্রাইভেট প্রপার্টি।'

'তাই নাকি?' বোকার অভিনয় শুরু করল কিশোর। 'পোড়া, ভাঙাচোরা বাড়ি, জঙ্গল···যার খুশি এখানে আসতে পারে। আসলে লেকটা দেখতে এসেছি। খুব নাম শুনেছি তো।'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই ডাকাত। ছেলেদের দেখে অবাক হয়েছে, বোঝা যায়।

'কিন্তু এ-হ্রদ দেখতে আসা উচিত হয়নি,' বলল মেয়েমানুষটা। 'খুব বাজে জায়গা, বিপদ হতে পারে। সাঁতার কাটা কিংবা নৌকা-চড়া এটাতে নিষেধ।'

'তা-তো বলেনি আমাদেরকে!' যেন খুব অবাক হয়েছে কিশোর। 'নিষিদ্ধ, তা-ও বলেনি। আপনারা ভুল খবর পেয়েছেন।'

'বাহ্, কি সুন্দর একটা ডাহুক গো!' হাত তালি দিয়ে নেচে উঠল রবিন। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে হ্রদের দিকে চেয়ে। 'কি ভাল জায়গা। কত জানোয়ার আর পাখি যে আছে।'

'বুনো ঘোড়াও নাকি অনেক,' মুসা যোগ করল। 'গতকালই তো দেখলাম কয়েকটাকে। খুব সুন্দর ছিল, না?'

দ্বিধায় পড়ে গেল দুই ডাকাত।

কড়া গলায় ধমক দিল ডারটি, 'চুপ! যত্তোসব! এখানে আসা নিষেধ, শুনছ? ঘাড়ে হাত পড়ার আগে কাটো।'

'নিষেধ?' কণ্ঠস্বর হঠাৎ পাল্টে ফেলল কিশোর, কঠিন হয়ে উঠেছে চেহারা। 'তাহলে আপনারা এখানে কি করছেন? আর, ভদ্রভাবে কথা বলুন।'

'তবে রে আমার ভদ্রলোক!' চেঁচিয়ে উঠল ডারটি, গেছে মেজাজ খারাপ হয়ে। শার্টের হাতা গোটাতে গোটাতে আগে বাড়ল।

রাফিয়ানের বেল্ট ছেড়ে দিল জিনা।

সামনে এগোল কুকুরটা। ভয়ানক হয়ে উঠেছে চেহারা, ঘাড়ের রোম খাড়া। চাপা ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে গলার গভীরে।

চমকে গেল ডারটি। পিছিয়ে গেল আবার। 'ধরো, কুত্তাটাকে ধরো! হারামী জানোয়ার!'

'হারামী লোকের জন্যে হারামী জানোয়ারই দরকার,' শান্ত কণ্ঠে বলল জিনা। 'তুমি যেমন কুকুর, ও-ও তেমন মুগুর। তোমরা যতক্ষণ কাছে-পিঠে থাকছ, ওকে ছেড়ে রাখব।'

চাপা গর্জন করে আরও দুই কদম এগোল রাফিয়ান। চোখে আগুন।

চেঁচিয়ে উঠল মেয়েলোকটা, 'হয়েছে হয়েছে, রাখো। এই মেয়ে, তোমার কুত্তাটা ধরো। আমার এই বন্ধু না···ওর মেজাজ ভাল না।'

'আমার এই বন্ধুটিরও মেজাজ খারাপ,' রাফিয়ানকে দেখাল জিনা। 'তোমাদের সইতে পারছে না। ঘাড়ে কামড় দিতে চায়। কতক্ষণ আছ তোমরা?'

'সেটা তোমাকে বলব কেন?' গর্জে উঠল ডারটি।

তার গর্জনের জবাবে দ্বিগুণ জোরে গর্জে উঠল রাফিয়ান। আরেক পা পিছিয়ে গেল ডারটি।

'চলো, খিদে পেয়েছে,' সঙ্গীদের বলল কিশোর। 'এদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আমরা যেমন অন্যের জায়গায় এসেছি, ওরাও এসেছে।'

সহজ ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল অভিযাত্রীরা। দুই পা এগিয়ে ফিরে চেয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আরেকবার শাসাল রাফিয়ান; তারপর চলল বন্ধুদের সঙ্গে।

দুই ডাকাতের চোখে তীব্র ঘৃণা, কিন্তু বিশাল কুকুরটার ভয়ে কিছু করতে পারল না, দৃষ্টির আগুনে ছেলেদের ভস্ম করার চেষ্টা চালাল শুধু।

ওদেরকে আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল জিনা, 'রাফি, খেয়াল রাখবি। ব্যাটাটাকে ধরবি আগে।'

পোড়া বাড়িটায় পৌঁছল ওরা। বলতে হলো না, রান্না ঘরের দরজায় পাহারায় বসল রাফিয়ান। দুই ডাকাতের দিকে ফিরে মুখ ভেঙচাল একবার, বুঝিয়ে দিল, কাছে এলে ভাল হবে না।

ভাঁড়ারে ঢুকল অন্যেরা। যেটা যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনিই আছে, কেউ হাত দেয়নি।

'ঢোকেইনি হয়তো এখনও,' বলল কিশোর। 'দেখেনি। যতটা ভেবেছি, তার চেয়েও বাজে লোক ওই দুটো, টিকসি আর ডারটি।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো মুসা, 'জঘন্য। মেয়েমানুষটা বেশি খারাপ। চেহারাটাও জানি কেমন রুক্ষ।'

'আমার কাছে ডারটিকেই বেশি খারাপ লেগেছে,' রবিন বলল। 'আস্ত একটা গরিলা। চুল কাটে না কেন?'

'কি জানি,' একটা রুটির মোড়ক খুলতে শুরু করল জিনা। 'হয়তো ভাবছে সিনেমায় চান্স-টান্স পাবে। টারজানের বিকৃত সংস্করণ।'

'রাফি না থাকলে কিন্তু বিপদে পড়তাম,' বলল রবিন। 'ও-ই ঠেকিয়েছে ব্যাটাদের।'

'কি করছে ব্যাটারা, দেখে আসা দরকার,' প্রায় অর্ধেকটা পাঁউরুটি আর এক খাবলা মাখন তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল মুসা।

আধ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে। রুটি আর মাখন শেষ। 'ব্যাটাকে দেখলাম বোটহাউসের দিকে যাচ্ছে। ওয়াটার মেয়ারকে খুঁজতে বোধহয়।'

'হুঁ,' খেতে খেতে বলল কিশোর। 'ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভালমত ভাবতে হবে। কি করবে ওরা এখন? জানা আমাদের জন্যে খুব জরুরী। হয়তো মেসেজের

পাঠোদ্ধার করে ফেলেছে ওরা,' কঠিন শব্দ ব্যবহার শুরু করল সে। 'ওদের ওপর চোখ রাখতে হবে। দুর্বল মুহূর্তে কিছু ফাঁস করে দিতে পারে আমাদের কাছে।'

'মেসেজের সঙ্গে যে নকশাটা দিয়েছে জেরি, নিশ্চয় তার কোন মানে আছে,' আপনমনে বলে যাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। 'হয়তো সেটা বুঝতে পেরেছে ডারটি আর টিকসি।' রুটি চিবাতে চিবাতে ভাবনার অতলে তলিয়ে গেল সে। দীর্ঘ নীরবতার পর ভেসে উঠল আবার। 'আজ বিকেলেই কিছু একটা করতে হবে আমাদের। ভেলাটা ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়ব হ্রদে। যে কোন ছেলেমেয়েই তা করতে পারে, এতে কিছু সন্দেহ করবে না দুই ডাকাত। নৌকাটা খুঁজব আমরা। আর যদি হ্রদে বেরোয় টিকসি আর ডারটি, একই সঙ্গে ওদের ওপরও চোখ রাখতে পারব।'

'চমৎকার বুদ্ধি,' আঙুলে চুটকি বাজাল জিনা। 'দারুণ সুন্দর বিকেল। হ্রদে ভেলা ভাসিয়ে দাঁড় টানা···আউফ! এখুনি বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।'

'আমারও,' মাথা কাত করল মুসা। 'ভেলাটা আমাদের ভার সইতে পারলেই হয়···জিনা, আরেক টুকরো কেক দাও তো। বিস্কুট আছে?'

'অনেক,' জবাব দিল রবিন। 'চকলেটও আছে।'

'খুব ভাল,' এক কামড়ে এক স্লাইস কেকের অর্ধেকটা কেটে নিয়ে চিবাতে শুরু করল মুসা। 'এখানেই থাকতে হবে মনে হচ্ছে। খাবারে টান না পড়লেই বাঁচি।'

'যে হারে গেলা শুরু করেছ,' জিনা ফোড়ন কাটল, 'শেষ না হয়ে উপায় আছে? বিদেশ-বিভুঁই, খাবারের সমস্যা আছে, একটু কম করে খাও না বাবা···'

'জিনা,' হাত বাড়াল কিশোর, 'জগটা দাও তো, পানি নিয়ে আসি। আর রাফির জন্যে কি দেবে দাও।'

ধীরে সুস্থে পুরো আধ ঘণ্টা লাগিয়ে লাঞ্চ শেষ করল ওরা। এবার বোটহাউসে গিয়ে ভেলা নিয়ে বেরোনো যায়।

বোট হাউসের দিকে রওনা হলো ওরা।

হ্রদের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল কিশোর, 'দেখো দেখো, ওই যে। নৌকা নিয়ে বেরিয়েছে ব্যাটারা। নিশ্চয় জলকুমারী, ওটাই একমাত্র ডোবেনি। শিওর, জলঘোটকীকে খুঁজছে ওরা।'

দাঁড়িয়ে গেল সবাই। মুসার মুখ গোমড়া হয়ে গেল। এত কষ্ট কি শেষে মাঠে মারা যাবে? তাদের আগেই ওয়াটার মেয়ারকে পেয়ে যাবে ওই দুই ডাকাত? ওরা কি জানে, নৌকাটা কোথায় লুকানো।

দেয়ালের ফোকর দিয়ে বোটহাউসে ঢুকল ওরা। সোজা এগোল ভেলার দিকে। ঠিকই আন্দাজ করেছে কিশোর, লিটল মারমেইডকেই নিয়ে গেছে।

ভেলার কোণার চার ধারে দড়ির হাতল লাগানো রয়েছে, ধরে নামানোর জন্যে। চারজনে চারটে হাতল ধরে ভেলাটা তুলে নিয়ে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। সতর্ক রয়েছে, ভারের চোটে না আবার ভেঙে পড়ে পুরানো সিঁড়ি।

ভাঙল না। পানির কিনারে চলে এল ওরা।

'এবার ছাড়ো,' বলল কিশোর। 'আস্তে।'

যতটা পারল আস্তেই ছাড়ল ওরা, কিন্তু ভারি ভেলা। ঝপাত করে পড়ল

পানিতে, পানি ছিটকে উঠে ভিজিয়ে দিল ওদের শরীর।

'দাঁড়গুলো খুলে নিয়ে এসো,' এক কোণার হাতল ধরে রেখেছে কিশোর, নইলে ভেসে যাবে ভেলা। 'জলদি।'

এগারো

ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের দাঁড় ঝোলানো রয়েছে দেয়ালে। ভেলা বাওয়ার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি চারটে ছোট দাঁড় রয়েছে ওগুলোর মধ্যে। খুলে নিয়ে আসা হলো ওগুলো।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছে রাফিয়ান। কোন কাজে সহায়তা করতে পারছে না। খারাপ লাগছে তার, বুঝিয়ে দিচ্ছে ভাবেসাবে।

কোণের হাতল ধরেই রয়েছে কিশোর। দাঁড় হাতে আগে উঠল মুসা। বালিতে দাঁড়ের ঠেকা দিয়ে ভেলা আটকাল। এরপর উঠল জিনা। দুজনেই দাঁড় বাওয়ায় ওস্তাদ। রবিন উঠল। সব শেষে উঠল কিশোর…না না, ভুল হলো, রাফিয়ানের আগে উঠল সে।

'রাফি, আয়,' হাত নেড়ে ডাকল জিনা। 'এ-রকম নৌকায় চড়িসনি আগে, কিন্তু অসুবিধে হবে না। আয়।'

সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পানির কিনারে নেমে এল রাফিয়ান। কালো পানি শুঁকল একবার, পছন্দ হচ্ছে না। তবে আর ডাকের অপেক্ষা করল না। মস্ত এক লাফ দিয়ে হঠাৎ করে এসে পড়ল ভেলায়।

জোরে ঝাঁকি দিয়ে এক পাশে কাত হয়ে গেল ভেলা।

দ্রুত আরেক পাশে একেবারে কিনারে চলে গেল রবিন, ভারসাম্য ঠিক করল। হেসে বলল, 'চুপ করে বোস। যা একখান বপু তোমার, নড়াচড়ারই আর জায়গা নেই। ডুবিয়ে মেরো না সব্বাইকে।'

রবিনের কথায় কিছু মনে করল না রাফিয়ান। চুপ করে বসল।

বালিতে দাঁড়ের মাথা ঠেকিয়ে লগি-ঠেলার মত করে ভেলাটাকে বোটহাউস থেকে বের করে আনতে শুরু করল মুসা। জিনাও হাত লাগাল। বোটহাউসের মুখের লতাপাতা অনেকখানি পরিষ্কার করে নিয়েছে দুই ডাকাত, নৌকা বের করার সময়। কাজেই ছেলেদের আর কিছু পরিষ্কার করতে হলো না। সহজেই খালে বেরিয়ে এল ওরা।

শান্ত পানি, ভেলাটাও শান্তই রইল। ঢেউ থাকলে অসুবিধে হত, বোঝা বেশি।

এক সঙ্গে দাঁড় বেয়ে চলল চারজনে।

রাফিয়ান দাঁড়িয়ে দেখছে। ভেলার পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে সরে যাচ্ছে পানি, বেশ মজা পাচ্ছে সে। ভাবছে বোধহয়, এটাও কোন ধরনের নৌকা। সাবধানে সামনের এক পা বাড়িয়ে পানি ছুঁল সে, ঠাণ্ডা, সুড়সুড়ি দিল যেন পায়ে। কুকুরে-হাসি হেসে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে, ভোঁতা নাকটা পানি ছুঁই ছুঁই করছে।

'মজার কুকুর তুই, রাফি,' বলল রবিন। 'শুয়েছিস, ভাল। দেখিস, লাফিয়ে

উঠিস না হঠাৎ। ভেলা উল্টে যাবে।'

খালের মুখের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভেলা। নৌকাটা দেখা যাচ্ছে না।

'ওই যে,' ভেলা আরও খানিক দূর এগোনোর পর হাত তুলল কিশোর। হ্রদের মাঝেই আছে এখনও নৌকাটা। লিটল মারমেইড। 'পিছু নেব নাকি? দেখব কোথায় যায়?'

'অসুবিধে কি?' বলল মুসা।

জোরে জোরে দাঁড় বাইতে শুরু করল সবাই। দুলে উঠল ভেলা।

'আরে, ও কি করছ?' কিশোরকে বলল মুসা। 'উল্টোপাল্টা ফেলছ তো। ভেলা এগোবে না, ঘুরবে খালি। এভাবে ফেলো, এই এভাবে,' দেখিয়ে দিল সে।

যতই দেখিয়ে দেয়া হোক, বিশেষ সুবিধে করতে পারল না কিশোর আর রবিন। বিরক্ত হয়ে শেষে বলল মুসা, 'না পারলে চুপ করে বসে থাকো। আমি আর জিনাই পারব। খালি খালি অসুবিধে করবে আরও।'

সানন্দে হাত গুটিয়ে বসল কিশোর। দাঁড় বাওয়ার চেয়ে মাথা খাটানো অনেক বেশি পছন্দ তার। তা-ই করল।

জিনা আর মুসাও খুব খুশি, মনের মত কাজ পেয়ে গেছে। ঘেমে উঠছে শরীর। উষ্ণ কোমল রোদ, বাতাস নেই, শরতের নির্মল বিকেল।

'দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে,' নৌকাটার দিকে ইশারা করে বলল জিনা। 'খুঁজছে। কিশোর, কি মনে হয়? আমাদেরটার মতই মেসেজ আছে ওদের কাছে? ইস্ যদি দেখতে পারতাম।'

কিশোরের নির্দেশে দাঁড় বাওয়া বন্ধ করল মুসা আর টিকসি। এতই ঝুঁকেছে, কপালে কপাল লেগে গেছে প্রায়।

'আস্তে দুই টান দাও তো,' বলল কিশোর। 'আরেকটু কাছে এগোই। দেখি, কি দেখছে ব্যাটারা।'

নৌকার একেবারে পাশে চলে এল ভেলা। ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফিয়ান। চমকে মুখ তুলে তাকাল দুই ডাকাত। ছেলেদের দেখে কালো হয়ে গেল মুখ।

'হাল্লো,' দাঁড় তুলে নাড়ল মুসা, হাসি হাসি মুখ। 'চলেই এলাম। খুব ভাল চলছে ভেলা। তোমাদের নৌকা কেমন?'

রাগে লাল হয়ে গেল টিকসির মুখ। চেঁচিয়ে বলল, 'কাকে বলে ভেলা বের করেছ? বিপদে পড়বে।'

'তাই তো জিজ্ঞেস করতে এলাম,' কিশোর বলল, 'তোমরা কাকে জিজ্ঞেস করে নৌকা বের করেছ। গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসব তার কাছ থেকে।'

হেসে উঠল জিনা, গা জ্বালিয়ে দিল দুই ডাকাতের।

কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে রাগে ফুলতে শুরু করল টিকসি। ডারটির ভাব দেখে মনে হলো, দাঁড়ই ছুড়ে মারবে কিশোরের মুখে। গর্জে উঠল, 'কাছে আসবি না বলে দিলাম। মেরে তক্তা করে দেব।'

'রাগ করছ কেন, ভাই?' মোলায়েম গলায় বলল মুনা। 'আমরা তো ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে এলাম। ভাব করে নেওয়া ভাল না?'

আবার হেসে উঠল জিনা, বিছুটি ডলে লাগাল যেন ডাকাতদের চামড়ায়।

পারলে ছেলেদের এখন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ওরা। কিন্তু সামলে নিল টিকসি। নিচু গলায় দ্রুত কিছু পরামর্শ করল ডারটির সঙ্গে। রাগে বার দুই মাথা ঝাঁকাল গরিলাটা, কিন্তু শেষে মেনে নিল টিকসির কথা। দাঁড় তুলে নিয়ে ঝপাং করে ফেলল পারিতে, দ্রুত বেয়ে চলল।

'চালাও,' বলল কিশোর। 'পিছু নাও,' সে-ও নিষ্ক্রিয় রইল না আর, অসুবিধে না করে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করতে চায় দাঁড় বাওয়ায়।

পশ্চিম তীরের দিকে নৌকা নিয়ে যাচ্ছে ডারটি। ভেলাটাও পিছে লেগে রইল। মাঝপথেই সাঁই করে নৌকার মুখ ঘোরাল।

নৌকা হালকা, ভেলা ভারি, চলনও নৌকার চেয়ে ভারি। ফলে, চারজনে বেয়েও একজনের সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। ঘনঘন ওঠানামা করছে বুক।

ডান তীরে নৌকা নিয়ে গেল ডারটি। ভেলাটা কাছাকাছি হওয়ার অপেক্ষায় রইল।

'ভাল এক্সারসাইজ, তাই না?' ডেকে বলল টিকসি। 'স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল।'

আবার হ্রদের মাঝখানে রওনা দিল নৌকা।

'খাইছে!' হুঁসস করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল মুসা। 'হাত অবশ হয়ে যাচ্ছে আমার। কি করছে ব্যাটারা?'

'খামোকা খাটিয়ে নিচ্ছে,' দাঁড় তুলে ফেলেছে কিশোর। 'আমরা থাকলে জলঘোটকীকে আর খুঁজবে না। খেলাচ্ছে আমাদের।'

'তাহলে আর খেলতে যাচ্ছি না আমি,' বুড়ো আঙুল নাড়ল মুসা। দাঁড় তুলে রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, হাঁপাচ্ছে।

অন্যেরাও বিশ্রাম নিতে লাগল।

বন্ধুদের অবস্থা দেখে করুণা হলো যেন রাফিয়ানের, উঠে এসে এক এক করে গাল চেটে দিল চারজনেরই। তারপর ভুল করে বসে পড়ল জিনার পেটের ওপর।

'হেই রাফি! আরে, দম বন্ধ হয়ে গেল তো আমার।' কুকুরটাকে জোরে ঠেলে দিল জিনা। 'ভারিও বটে! বাপরে বাপ!'

খুব অন্যায় হয়ে গেছে, বুঝতে পারল রাফিয়ান। আরেকবার জিনার গাল চেটে দিতে গেল।

এত বেশি শান্ত, এসব ভাল লাগছে না জিনার। থাপ্পড় দিয়ে সরিয়ে দিল কুকুরটার মুখ।

'নৌকাটা কই?' উঠে বসে দেখার শক্তিও নেই যেন রবিনের।

গোঙাতে গোঙাতে উঠে বসল কিশোর। 'ওফ্ফ্,' বিকৃত করে ফেলল মুখ, 'পিঠটা গেছে। ব্যথাআ! গেল কই হতচ্ছাড়া নৌকা···ও, ওই যে, খালের দিকে যাচ্ছে। আপাতত জলঘোটকী খোঁজা বাদ।'

'আমাদেরও বাদ দেয়া উচিত,' হাতের পেশী টিপতে টিপতে বলল রবিন। 'যা ব্যথা হয়েছে, কালও বেরোতে পারব কিনা···হেই রাফি, সর! আমার ঘাড়ে কি মধু? যা, চাটতে হবে না।'

'চলো, আমরাও ফিরে যাই,' বলল কিশোর। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর নৌকা খোঁজার সময় নেই।'

'চলো,' জিনা বলল। 'দাঁড়াও আরেকটু জিরিয়ে নিই। আরি, আবার বসল দেখি পায়ের ওপর···এই রাফি, সর। লাথি মেরে ফেলে দেব কিন্তু পানিতে।'

কিন্তু লাথি আর মারতে হলো না। পানিতে পড়ার শব্দ হলো। লাফিয়ে উঠে বসল জিনা। ভেলায় নেই রাফিয়ান।

পানিতে সাঁতার কাটছে। খোশমেজাজেই আছে।

'কি আর করবে বেচারা?' হেসে বলল মুসা। 'সবাই খালি দূর দূর করছ। ভেলায় নেই জায়গা। বসবে কোথায় ও? মনের দুঃখে তাই আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োতে চাইছে।'

'তুমি ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছ,' রেগে উঠল জিনা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মুসা। 'খেয়েদেয়ে তো আর কাজ নেই আমার।'

'তাহলে পড়ে কি করে?'

'আমি কি জানি?'

'দেখো, আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলবে না···'

'তো কিভাবে···'

'আহ্, কি শুরু করলে?' ধমক দিল কিশোর। 'চুপ করো। রাফিকে টেনে তোলা দরকার। নিজে নিজে উঠতে পারবে না ও।'

টেনেহিঁচড়ে ভেলায় তোলা হলো রাফিয়ানকে। মুসাই সাহায্য করল বেশি। লজ্জিত হয়েছে জিনা। এখন আবার মুসার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করছে।

উঠেই জোরে গা ঝাড়া দিল রাফিয়ান। পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিল সবার চোখমুখ। 'এহ্হে,' পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে হেসে উঠল রবিন, 'ব্যাটা নিজেও ভিজেছে, আমাদেরও ভেজাচ্ছে।'

দেখতে দেখতে আবার সহজ হয়ে এল ওরা। তখন এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, মেজাজ ঠিক রাখতে পারছিল না কেউই।

খুব সুন্দর বিকেল। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে কিশোরের চোখ। ধীরে ধীরে দাঁড় টানছে জিনা আর মুসা। হ্রদের কালচে নীল পানিতে ঢেউয়ের রিঙ তৈরি হচ্ছে, বড় হতে হতে ছড়িয়ে গিয়ে ভাঙছে সোনালি ঝিলিক তুলে। ভেলার দুপাশেও সোনালি ফেনা। পাশে সাঁতার কাটছে দুটো জলমোরগ, বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা ঘোরাচ্ছে আর কিঁক কিঁক করছে, আসছে ভেলার সঙ্গে সঙ্গে।

পানির কিনারে পাড়ের ওপর গড়িয়ে ওঠা বড় বড় গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে চলে গেছে রবিনের নজর। সিঁদুর-লাল আকাশ। মাইলখানেক দূরের পাহাড়ী ঢালে বিশেষ একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার।

উঁচু একটা পাথর।

সেটার দিকে হাত তুলে বলল রবিন, 'কিশোর, দেখো? ওই যে পাথরটা। সীমানার চিহ্ন? অনেক বড় কিন্তু।'

'কই?' কিশোর বলল। 'ও, ওটা? কি জানি, বুঝতে পারছি না।'

'অনেক লম্বা…' বলতে গেল মুসা।

কথাটা ধরে ফেলল কিশোর। কি যেন মনে পড়ে গেছে। 'লম্বা! টল স্টোন! নকশায় লেখা রয়েছে না?'

'হ্যাঁ, তাই তো,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। চেয়ে আছে দূরের পাথরটার দিকে।

চার জোড়া চোখই এখন ওটার দিকে। ভেলা চলছে। আস্তে আস্তে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল পাথরটা।

'টল স্টোন,' আবার বিড়বিড় করল কিশোর। 'ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'তোমার কি মনে হয়,' জিনা বলল, 'ওটার তলায়ই লুকানো আছে লুটের মাল?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'হয়তো একটা দিক-নির্দেশ…এই, জলদি বাও। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার, রাতের আগে।'

বারো

বোটহাউসে ঢুকল ভেলা। খুঁটিতে আগের জায়গায় বাঁধা রয়েছে লিটল মারমেইড, ডারটি আর টিকসি নেই।

'গেল কোথায়?' টর্চ জ্বেলে দেখছে কিশোর। 'শোনো, ভেলাটা এখানে রাখা ঠিক না। চলো, কোন ঝোপের তলায় লুকিয়ে রাখি।'

ঠিকই বলেছে কিশোর। অন্যেরাও একমত হলো। হাত অবশ হয়ে গেছে। তবু কোনমতে ভেলাটা আবার বের করে এনে পানির ওপর এসে পড়া কিছু ডালপাতার তলার শেঁকড়ে শক্ত করে বাঁধল।

লতা আর শেঁকড় ধরে ধরে পাড়ে উঠে রওনা হলো আস্তানায়। চোখ চঞ্চল দুই ডাকাতকে খুঁজছে। ছায়াও দেখা যাচ্ছে না ওদের। পোড়া বাড়িতে ভাঁড়ারে ঢুকে বসে নেই তো?

আগে রাফিয়ানকে ঢুকতে বলল ওরা।

সিঁড়িমুখে মাথা ঢুকিয়ে দিল রাফিয়ান। শব্দ করল না। সিঁড়ি টপকে নেমে গেল নিচে।

নেমেই গোঁ গোঁ করে উঠল।

'কি ব্যাপার?' বলল কিশোর। 'বসে আছে নাকি নিচে?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল জিনা। 'অন্য কিছু।'

'কী?'

'চলো না, নেমেই দেখি,' সিঁড়িতে পা রাখল জিনা।

বিছানা যেভাবে করে রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি রয়েছে। ব্যাজ আর কাপড়-চোপড়ও রয়েছে জায়গামত। মোম জ্বেলে টর্চ নিভিয়ে দিল কিশোর।

'কি হয়েছে, রাফি?' জিজ্ঞেস করল জিনা। 'এমন করছিস কেন?'

গোঙানি থামছে না রাফিয়ানের।

'গন্ধ পেয়েছে নাকি?' চারপাশে তাকিয়ে বলল মুসা। 'ওরা এসেছিল এখানে?'

'আসতেও পারে,' রবিন বলল।

'মরুকগে,' হাত নাড়ল মুসা। 'খিদে পেয়েছে। কিছু খেলে কেমন হয়?'

'ভালই হয়, আমারও খিদে পেয়েছে,' বলতে বলতে আলমারির দিকে এগোল কিশোর। কিন্তু টান দিয়ে দরজা খুলেই স্থির হয়ে গেল।

নেই!

অথচ ওখানেই রেখে গিয়েছিল সব খাবার। থালা-বাসন, প্লেট-কাপ, সব সাজানোই রয়েছে আগের মত, নেই শুধু খাবারগুলো। রুটি নেই, বিস্কুট নেই, চকলেট নেই···কিচ্ছু নেই।

কিশোরের ভাব দেখেই বুঝল অন্যেরা, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। এগোল আলমারির দিকে।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'কিছুই তো নেই। একটা বিস্কুটও না। ইস্ আগেই ভাবা উচিত ছিল। আল্লাহ্‌রে, কি খেয়ে বাঁচি এখন।!'

'খুব চালাকি করেছে,' রবিন বলল। 'জানে, খাবার ছাড়া থাকতে পারব না এখানে। আমাদের তাড়ানোর এটাই সবচেয়ে ভাল কৌশল। রাতে খিদেয় মরব, সকালে উঠেই দৌড়াতে হবে গাঁয়ে, অনেক সময় পাবে ওরা।'

মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে আলমারির কাছেই বসে পড়ল মুসা। 'গাঁয়ে যাওয়ারও সময় নেই এখন। যা পথ-ঘাট, অন্ধকার! উফ্, খিদেও পেয়েছে। নাহ্ রাতটা টিকব না।'

মন খারাপ হয়ে গেছে সবার। কতক্ষণ আর খিদে সওয়া যায়? ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, ভেবেছিল খেয়েদেয়ে চাঙা হবে, তার আর উপায় নেই।

বিছানায় বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন। 'একবার ভেবে ছিলাম, কয়েকটা চকলেট সরিয়ে রেখে যাই, রাখলাম না···রাফি, ওভাবে আলমারির দিকে চেয়ে লাভ নেই। কিচ্ছু নেই ওতে।'

আলমারি শুঁকছে, আর করুণ চোখে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে রাফিয়ান।

'হারামীগুলো কোথায়?' হঠাৎ রেগে গেল কিশোর। 'ব্যাটাদের একটা শিক্ষা দেয়া দরকার। বুঝিয়ে দেয়া দরকার লোকের খাবার চুরি করার ফল।'

'হুফ,' পুরোপুরি একমত হলো রাফিয়ান।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল কিশোর। দুই ডাতাক কোথায়? ভাঙা, শূন্য দরজার কাছে গিয়ে দূরে তাকাল।

বনের মাঝে এক জায়গায় দুটো তাঁবু খাটানো হয়েছে। তাহলে ওখানেই ঘুমানোর ব্যবস্থা করেছে, ভাবল সে। চোরগুলোকে গিয়ে গালাগাল করে আসবে নাকি? হ্যাঁ, তাই যাবে।

'আয়, রাফি,' বলে পা বাড়াল কিশোর।

কিন্তু তাঁবুতে কেউ নেই। কয়েকটা কম্বল, একটা প্রাইমাস স্টোভ, একটা কেটলি আর অন্যান্য কিছু দরকারী জিনিস অগোছাল হয়ে পড়ে আছে। একটা তাঁবুর কোণে গাদা করে রাখা আছে কি যেন, কাপড় দিয়ে ঢাকা।

টিকসি আর ডারটি গেল কোথায়?

খুঁজতে বেরোল কিশোর।

পাওয়া গেল হ্রদের ধারে গাছের তলায়, পায়চারি করছে। কথা বলছে। বাহ্, সান্ধ্য-ভ্রমণ, মুখ বাঁকাল সে। দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে, ভাবছে কিছু। যে কাজে এসেছিল, সেটা না করে ফিরে চলল আস্তানায়।

পেছনে রাফিয়ান, বাতাসে কি যেন শুঁকতে শুঁকতে চলেছে।

'তাঁবু খাটিয়েছে,' বন্ধুদের জানাল কিশোর। 'ব্যাটারা রয়েছে লেকের পাড়ে। লুটের মাল না নিয়ে যাবে না।'

'আরে রাফি কোথায়?' সিঁড়িমুখের দিকে চেয়ে আছে জিনা। 'কিশোর, কোথায় ফেলে এলে ওকে ?'

'পেছনেই তো আসছিল···দেখি তো,' সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল কিশোর। ওপরে মেঝেতে পরিচিত নখের শব্দ।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রাফিয়ান।

'আরে, দেখো, মুখে করে কি জানি নিয়ে এসেছে।' বলে উঠল জিনা।

তার কোলের কাছে এনে জিনিসটা রাখল রাফিয়ান।

'বিস্কুটের টিন!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'পেল কই?'

নীরব হাসিতে ফেটে পড়ল কিশোর। বলল, 'আমি যা করব ভাবছিলাম, রাফিই সেটা করে ফেলল। তাঁবুতে কাপড়ে ঢাকা রয়েছে খাবার, অনেক খাবার। ফিরে এসেছি, সবাই মিলে গিয়ে লুট করে আনার জন্যে। আর দরকার হবে না।'

আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে রাফিয়ান।

'ওরা যেমন করমচা, আমরা তেমনি বাঘা তেঁতুল,' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'কারও চেয়ে কেউ কম নই।···রাফিটা আবার গেল?'

'যাক,' বলল জিনা।

এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল রাফি। মুখে বাদামী কাগজে মোড়া মস্ত এক প্যাকেট।

বিশাল কেক।

হেসে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল গোয়েন্দারা।

'রাফি, তুই একটা বাঘের বাচ্চা,' হাসি থামাতে পারছে না মুসা।

'আরে না, সিংহের,' শুধরে দিল জিনা।

'আমার তো মনে হয় ওর বাপ বাবুর্চি ছিল,' পেট চেপে ধরেছে রবিন, চোখের কোণে পানি। 'বেছে বেছে পছন্দসই খাবারগুলো আনছে।'

আবার চলে গেছে রাফিয়ান। ফিরে এল শক্ত মলাটের একটা বাক্স নিয়ে। গরুর মাংসের বড়া।

'তাজ্জব করে দিল দেখি।' বলল মুসা। 'কোথায় পেটে পাথর বাঁধার কথা ভাবছিলাম, আর হাজির হয়ে গেল একেবারে রাজকীয় ভোগ···'

'দারুণ হয়েছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমাদেরগুলো ব্যাটারা নিয়েছে, আমরা ওদেরগুলো নিয়ে এসেছি। রাফি, আবার যা।'

কিশোরের বলার আগেই রওনা দিয়েছে রাফিয়ান।

ছুটি

কি আনে, দেখার জন্যে উৎসুক হয়ে রইল চারজন।

নিয়ে এল আরেক বাক্স মাংসের কাবাব।

'তুই একটা সাংঘাতিক লোক, রাফি!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল মুসা, 'খুব ভাল মানুষ। এত সুগন্ধ, তা-ও ছুঁয়েও দেখছিস না। আমি হলে তো চাখার লোভ সামলাতে পারতাম না।'

খাবার চুরি করার নেশায় পেয়েছে রাফিয়ানকে। যাচ্ছে-আসছে, যাচ্ছে-আসছে, প্রতিবারেই মুখে করে নিয়ে আসছে একটা কিছু।

'এবার ওকে থামানো দরকার,' বলল কিশোর। 'যথেষ্ট হয়েছে। যা নিয়েছিল ব্যাটারা, তার তিনগুণ এসেছে।'

'থাক, শুধু আরেকবার,' হাত তুলল জিনা। 'দেখি, এবার কি আনে।'

টেনে-হিঁচড়ে ইয়া বড় এক বস্তা নিয়ে হাজির হলো রাফিয়ান।

আবার হাসাহাসি শুরু হলো। না ঠেকালে সব নিয়ে আসবে। কিছু রাখবে না, শূন্য করে দিয়ে আসবে।

'রাফি,' বেল্ট টেনে ধরল জিনা, 'আর না। শুয়ে পড়, জিরিয়ে নে। বাঁচালি আমাদের।'

প্রশংসায় খুব খুশি হলো রাফিয়ান। জিনার গালটা একবার চেটে দিয়ে গড়িয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে।

বস্তাটা খুলল মুসা। ঘরে বানানো পাঁউরুটি আর বনরুটি। 'হুররে...' আনন্দে নাচতে শুরু করল সে। 'রাফি, তো পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে ইচ্ছে করছে।'

কি বুঝল কুকুরটা কে জানে, একটা পা বাড়িয়ে দিল।

'নাও, করো এবার,' হা-হা করে হেসে উঠল কিশোর। সবাই যোগ দিল হাসিতে।

পেট পুরে খেলো ওরা। রাফিয়ানের পেট ফুলে ঢোল, নড়তে পারছে না ঠিকমত। হাস্যকর ভঙ্গিতে পেটটাকে দোলাতে দোলাতে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে, পানি খাওয়ার জন্যে। কল ছেড়ে দিল জিনা। সামনের দুই পা সিংকে তুলে দিয়ে পানি খেলো রাফিয়ান।

সিংক থেকে থাবা নামিয়েই স্থির হয়ে গেল সে। ঘুরে বনের দিকে চেয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

ছুটে এল সবাই। ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে ডারটির মাথা দেখা যাচ্ছে। এদিকেই আসছে।

কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আমাদের খাবার চুরি করেছ?'

'কে বলল?' চেঁচিয়ে জবাব দিল কিশোর, 'আমাদের খাবারই আমরা ফিরিয়ে এনেছি।'

'এত্তবড় সাহস, আমার তাঁবুতে হানা...' রাগে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল ডারটির। ঝাঁকড়া চুল নাড়ল, সাঁঝের আবছা আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে তার চেহারা, চুলের জন্যে।

'না আমরা যাইনি,' সহজ কণ্ঠে বলল কিশোর, 'রাফি গিয়েছিল। আমরা বরং

ঠেকিয়েছি, নইলে রাতে তোমাদের খাওয়া জুটত না। আমাদের তো উপোস রাখতে চেয়েছিলে, আমরা তোমাদের মত অত ছোটলোক নই···না, না, আর কাছে এসো না, রাফি রেগে যাবে। আর হ্যাঁ, সারা রাত পাহারায় থাকবে ও। গায়ে ওর সিংহের জোর, মনে রেখো।'

'গররররর,' এত জোরে গর্জন করল রাফিয়ান, লাফিয়ে উঠল ডারটি। তার মনে হলো সিংহেরই গর্জন।

ভীষণ রাগে হাত নেড়ে ঝটকা দিয়ে ঘুরল সে। চলে গেল।

সিঁড়িমুখে রাফিয়ানকে মোতায়েন করে ভাঁড়ারে ফিরল চারজন।

'ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'নিশ্চয় পিস্তল-টিস্তল কিছু আনেনি, নইলে এতক্ষণে গুলি করে মারত রাফিকে।'

'তাড়াতাড়ি করা দরকার আমাদের,' বলল রবিন। 'মালগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে পালানো দরকার। ঠিকই বলেছ, ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই। কখন যে কি করে···আচ্ছা, নকশা নিয়ে বসলে কেমন হয়? টল স্টোন তো দেখেছি।'

নকশা বের করে সমাধান করতে বসল ওরা।

'এই যে,' একটা রেখার মাথায় আঙুল রাখল কিশোর। 'তাহলে, এটার উল্টো দিকে টক হিল, এই যে,' আরেক মাথায় আঙুল রাখল।

'তুমি ভাবতে থাকো,' চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। 'আমি একটু গড়িয়ে নিই। গতর খাটানোর দরকার পড়লে ডেকো।'

মোমের আলোয় গভীর মনোযোগে নকশাটা দেখছে কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। বিড়বিড় করল, 'চারটে···টল স্টোন···টক হিল···চিমনি···স্টীপ্‌ল্‌।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউরেকা! ইউরেকা!'

লাফিয়ে উঠে বসল মুসা। 'আমেরিকা আবিষ্কার করলে নাকি?'

'না, লুটের মাল।'

'কোথায়?' ঘরের চারদিকে তাকাল গোয়েন্দা-সহকারী। চোখে বিস্ময়।

'আরে ওখানে না, এখানে,' নকশাটায় হাত রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। 'বুঝে গেছি।'

তেরো

'এক এক করে ধরা যাক,' উত্তেজনায় মৃদু কাঁপছে কিশোরের গলা। 'টু-ট্রীজ। এই যে, এখানে। ব্ল্যাক ওয়াটার। যেখানে লুটের মাল লুকানো রয়েছে। ওয়াটার মেয়ার। যার মধ্যে লুকানো রয়েছে। হ্রদের পানিতে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে নৌকাটা।'

'বলে যাও,' জিনা আর রবিনকে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে বসল মুসা।

'টিকসি হয়তো জেরির পুরানো বান্ধবী,' বলল কিশোর, 'তাহলে জেরির কাজকর্মের সঙ্গে পরিচয় আছে তার। নকশার মানে বুঝে ফেলেছে। বুঝেছে, কোথায় লুকানো রয়েছে নৌকাটা।'

কাগজের এক জায়গায় তর্জনী দিয়ে খোঁচা মারল সে। 'এখন দেখি, আমরা কি বুঝেছি। টল স্টোন তো দেখেছি আমরা, নাকি? বেশ। লেকের এমন কোন জায়গা

আছে, যেখান থেকে শুধু টল স্টোন নয়, টক হিল, চিমনি, স্টীপল্‌ও দেখা যাবে। চারটে জিনিসই এক জায়গা থেকে দেখা যাবে। এবং ওই জায়গায়ই লুকানো রয়েছে লুটের মাল।'

অন্য তিনজন নীরব।

'আমি একটা গাধা,' সরল মনে স্বীকার করল মুসা। 'এই সহজ ব্যাপারটা বুঝলাম না। লুটের মাল রয়েছে, তারমানে ওয়াটার মেয়ারকেও ওখানেই পাওয়া যাবে। গিয়ে খালি তুলে নেয়া।'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'তবে ডারটি আর টিকসির কথা ভুলো না। আমাদের আগে ওরাও গিয়ে হাজির হতে পারে, তুলে নিতে পারে জিনিসগুলো। কেড়ে নিতে পারব না, আমরা পুলিশ নই। নিয়ে সোজা চলে যাবে, রুখতেও পারব না।'

সবাই উত্তেজিত।

'তাহলে তো কাল ভোরেই যাওয়া উচিত,' বলল রবিন। 'আলো ফুটলেই বেরিয়ে পড়ব। ডারটি আর টিকসির আগেই গিয়ে তুলে নেব। ইস্‌, একটা অ্যালার্ম-ক্লক থাকলে ভাল হত।'

'ভেলায় করে চলে যাব,' মুসা বলল। 'বাকি তিনটে চিহ্ন খুঁজে বের করে...'

'তিনটে নয়, দুটো,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'চিমনিটা টু-ট্রীজেই রয়েছে। খেয়াল করোনি, এ-বাড়িটার বাঁয়ে উঁচু একটা চিমনি?'

'আমি করেছি,' রবিন বলল।

আরও কিছুক্ষণ পরামর্শ আর আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো, ভোরে উঠেই বেরোবে। রাত বেশি না করে শুয়ে পড়ল ওরা, নইলে সকাল সকাল উঠতে পারবে না।

সিঁড়িমুখের কাছে শুয়ে আছে রাফিয়ান, চোখ বন্ধ, কান সজাগ।

সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছে, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেরা।

কেউ বিরক্ত করল না সে-রাতে। খাবারের গন্ধে লোভ সামলাতে না পেরে চুপি চুপি এসে উঁকি দিল একবার সেই শেয়ালটা। নড়লও না রাফিয়ান, চোখও মেলল না, চাপা গলায় গরগর করল শুধু একবার। তাতেই যা বোঝার বুঝে নিয়ে ফোলা লেজ আরও ফুলিয়ে পালাল শেয়াল মহাশয়। কর্কশ চিৎকার করে উঠল একটা হুতুম পেঁচা। ওটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কা-কা করল একটা দাঁড়কাক, ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

হামাগুড়ি দিয়ে এল যেন আবছা আলো, বনের কালো অন্ধকারকে কঠিন হাতে তাড়ানোর সাহস নেই বুঝি। উঠে গা ঝাড়া দিয়ে ভাঙা দরজার কাছে এগোল রাফিয়ান। তাঁবু দুটো দেখল। চোখে পড়ল না কাউকে। ফিরে এসে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এল ভাঁড়ারে।

সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেল মুসা আর কিশোর।

'কটা বাজে?' ঘড়ি দেখেই চমকে উঠে বসল কিশোর। 'সাড়ে সাতটা।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'এই ওঠো ওঠো। দুপুর হয়ে গেছে।'

দ্রুত হাত মুখ ধুয়ে, দাঁত মেজে, চুল আঁচড়ে নিল ওরা। পরনের কাপড় ঝেড়ে নিল হাত দিয়ে। তাড়াতাড়ি খাবার বেড়ে দিল রবিন আর জিনা। নাকেমুখে

কোনমতে খাবারগুলো গুঁজে দিয়ে সিংকের কল থেকে পানি খেলো।

বেরোনোর জন্যে তৈরি।

তাঁবুর কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'গুড,' বলল কিশোর। 'ঘুম থেকে ওঠেনি। আমরাই আগে যাচ্ছি।'

ভেলায় চড়ে বসল অভিযাত্রীরা। দাঁড় তুলে নিল হাতে। সবাই উত্তেজিত, রাফিয়ানও।

'আগে টল স্টোনটা বের করি,' ঝপাত করে পানিতে দাঁড় ফেলল কিশোর।

হ্রদের মাঝখানে চলে এল ওরা। টল স্টোন চোখে পড়ছে না। চেয়ে চেয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল। গেল কোথায় উঁচু পাথরটা?'

সবার আগে দেখল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, 'ওই যে, ওইই, উঁচু গাছগুলোর পরে…'

'টল স্টোন তো পাওয়া গেল,' বলল কিশোর। 'এই, তোমরা উল্টোদিকে চাও তো, টক হিল দেখা যায় কিনা? কোন পাহাড়-টাহাড়? আমি টল স্টোনের ওপর চোখ রাখলাম। দরকার হলে ভেলটা সামনে পেছনে কোরো।'

টক হিলও মুসাই আগে দেখল। 'পেয়েছি।' বলল সে। 'ওটাই। দেখো দেখো, অদ্ভুত একটা পাহাড়, পিরামিডের মত চূড়া…কিশোর, টল স্টোন এখনও দেখা যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'তুমি পাহাড়টা থেকে চোখ সরিও না। জিনা, দেখো তো স্টীপ্‌ল্ দেখা যায় কিনা?' টল স্টোনের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না সে। 'দেখো, পুরানো বাড়ি, গির্জা, মন্দিরের চূড়া বা স্তম্ভ…'

'দেখেছি, দেখেছি!' এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল জিনা, যার যার চিহ্ন থেকে চোখ সরিয়ে ফেলল মুসা আর কিশোর। রবিন আগেই সরিয়েছে।

সকালের রোদে ঝলমল করছে গির্জার পাথরে তৈরি চূড়া।

'চমৎকার,' বলল কিশোর। 'রবিন, দেখো তো, চিমনিটা দেখা যায়?'

'না,' রবিন বলল। 'মুসা আরেকটু বাঁয়ে সরাও…আরেকটু…হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছি। আর না, আর না…'

দাঁড় বাওয়া বন্ধ। কিন্তু এক জায়গায় স্থির থাকল না ভেলা, আপনগতিতে অল্প অল্প করে সরে গেল। পানিতে বার দুই দাঁড়ের খোঁচা মেরে আবার সরাতে হলো ভেলাটা। ইতিমধ্যে গির্জা হারিয়ে ফেলেছে জিনা।

একটু ওদিক, একটু ওদিক করে করে আবার জায়গামত আনা হলো ভেলা, আবার চারটে চিহ্ন চোখে পড়ল।

'কিছু একটা মারকার ফেলে জায়গাটার চিহ্ন রাখা দরকার,' টল স্টোন থেকে চোখ সরাল না কিশোর। 'জিনা, দেখো তো, চূড়া আর পাথরের ওপর একসঙ্গে চোখ রাখতে পারো নাকি?'

'দেখি চেষ্টা করে,' চূড়া থেকে চোখ সরিয়ে চট করে পাথরটার দিকে তাকাল জিনা, তারপর আবার চূড়ার দিকে। কাজটা সহজ নয়। ভেলা খালি নড়ছে, স্থির রাখা যাচ্ছে না পুরোপুরি, যাবে বলেও মনে হয় না।

দ্রুত হাত চালাল কিশোর। একটা টর্চ আর পকেট-ছুরি বের করল। 'জিনা,

তোমার ব্যাগে ফিতা আছে?'

'দেখো, আছে কয়েকটা,' দুটো চিহ্নের ওপর চোখ রাখতে হিমশিম খাচ্ছে জিনা।

একটার সঙ্গে আরেকটা ফিতের মাথা বেঁধে জোড়া দিয়ে লম্বা করল কিশোর। ছুরি আর টর্চ এক করে ফিতের একমাথা দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর ফিতে ধরে ছেড়ে দিল পানিতে, আস্তে আস্তে ছাড়তে লাগল। টান থেমে গেল এক সময়, বোঝা গেল হ্রদের তলায় পৌঁছেছে ভার।

এক হাতে ফিতে ধরে রেখে আরেক হাতে পকেট খুঁজল কিশোর। এক অলস মুহূর্তে একটা কর্ককে ছুরি দিয়ে কেটে চেঁচে একটা ঘোড়ার মাথা বানিয়েছিল, সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওটা। বের করল পকেট থেকে। ফিতেটাকে টান টান করে এমন এক জায়গায় কর্ক বাঁধল, যেন ওটা পানির সমতলের ঠিক নিচে ভাসে।

ভেসে রইল কর্কটা, দাঁড়ের নড়াচড়ায় আলতো ঢেউ উঠছে, তাতে লুকোচুরি খেলতে থাকল ঘোড়ার মাথা।

'হয়েছে,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'চিহ্ন থেকে চোখ সরাতে পারো।'

ঘোড়ার মাথাটার দিকে তাকাল মুসা। 'এত আগাম চিন্তা করো কিভাবে?' বন্ধুর বুদ্ধির তারিফ করল সে। 'কিন্তু জিনিসটা বেশি ছোট। আবার খুঁজে বের করতে পারব? বড় কিছু হলে ভাল হত না?'

'সেটাই ভাবছি,' বলল কিশোর। 'কিন্তু বড় আর কি আছে?'

'আমার মেকআপ বক্সটা ধার নিতে পারো,' জিনা বলল। 'দাও,' হাত বাড়াল কিশোর।

ব্যাগ খুলে বেশ বড় একটা প্লাসটিকের বাক্স বের করল জিনা। খুব শক্ত হয়ে লাগে ডালা, ভেতরে পানি তো ঢুকবেই না, বাতাসও ঢোকে না তেমন, বায়ুনিরোধকই বলা চলে। ভেসে থাকবে। এক এক করে লিপস্টিক, পাউডারের কৌটা, চিরুনি আর টুকিটাকি অন্যান্য জিনিস ব্যাগে রেখে বাক্সটা দিল সে।

'মেয়েদের অকাজের বাক্সও অনেক সময় কাজে লাগে,' ফস করে বলে ফেলল মুসা।

টান দিয়ে বাক্সটা সরিয়ে আনল জিনা। 'দেখো, ভাল হবে না। আমাকে রাগালে বাক্স দেব না আমি।'

'না না, দাও, এমনি ঠাট্টা করলাম,' তাড়াতাড়ি বলল মুসা।

কর্কের পরে বাড়তি যে ফিতেটুকু রয়েছে, সেটা দিয়ে বাক্স বেঁধে পানিতে ছাড়ল কিশোর। ভেসে রইল। বোঝা যাচ্ছে, থাকবে।

'ফাইন,' বলল কিশোর। 'এবার দূর থেকেও চোখে পড়বে। দেখি তো, তলায় কি আছে?'

ভেলার ধার দিয়ে ঝুঁকে চারজনেই নিচে তাকাল। কিছুই না বুঝে রাফিয়ানও গলা বাড়িয়ে দিল পানির দিকে।

অদ্ভুত এক দৃশ্য। হ্রদের তলায় বড় কালো একটা ছায়া। ছোট ছোট ঢেউয়ের জন্যে অস্পষ্ট লাগছে, কেমন কাঁপা কাঁপা, তবে নৌকা যে তাতে কোন সন্দেহ

নেই।

'ওয়াটার মেয়ার,' বিড়বিড় করল মুসা।

'জেরি ব্যাটা খুব চালাক,' কিশোর বলল। 'লুটের মাল লুকানোর কি একখান জায়গা খুঁজে বের করেছে। নৌকার তলা ফুটো করে ডুবিয়েছে নিশ্চয়।'

'কিন্তু নৌকাটা তুলব কি করে?'

'তাই তো ভাবছি,' থেমে গেল কিশোর। ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে রাফিয়ান।

একটা নৌকা ছুটে আসছে এদিকে, লিটল মারমেইড। টিকসি আর ডারটি দুজনেই দাঁড় বাইছে। ভেলার দিকে খেয়াল নেই, হ্রদের চারপাশের তীরের দিকে চোখ, একবার এদিক চাইছে, একবার ওদিক। বোঝা গেল, চিহ্নগুলো খুঁজছে ওরা।

'তৈরি হয়ে যাও, সবাই,' আস্তে বলল কিশোর। 'আজ আমাদের বাধা না-ও মানতে পারে।'

চোদ্দ

কাছে এগিয়ে আসছে নৌকা। দাঁড় তুলে নিয়েছে টিকসি, দুই-তিনটা চিহ্নের ওপর একা চোখ রাখতে হচ্ছে তাকে। খালি মাথা ঘোরাচ্ছে এপাশ-ওপাশ।

ঘেউ ঘেউ করেই চলেছে রাফিয়ান।

তার মাথায় হাত রেখে শান্ত হতে বলল জিনা।

দুই ডাকাতের অবস্থা দেখে হাসি পেল অভিযাত্রীদের। ওরা চারজন চারটে চিহ্নের ওপর চোখ রাখতে হিমশিম খাচ্ছিল, আর দুজনের কতখানি অসুবিধে হবে সে তো বোঝাই যায়।

নির্দেশ দিচ্ছে টিকসি, 'এদিকে আরেকটু বাঁয়ে···এহ্‌হে, বেশি হয়ে গেল··· ডানে-ডানে-ডানে···'

কিছু বলল ডারটি।

ঝট করে মুখ ফিরিয়ে তাকাল টিকসি। ভেলাটা দেখে রাগে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই আবার ফিরল চিহ্নগুলোর দিকে। নিচু গলায় বলল কিছু ডারটিকে। মাথা ঝাঁকাল-ডারটি। ভীষণ হয়ে উঠেছে দুজনেরই চেহারা।

গতি বাড়ছে নৌকার, সোজা এগিয়ে আসছে।

'আরে, ধাক্কা মারো!।' বলে উঠল রবিন।

ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল ভেলা, আরেকটু হলেই পানিতে উল্টে পড়ে যাচ্ছিল রবিন, খপ করে তার হাত চেপে ধরল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, 'এই চোখের মাথা খেয়েছ! শয়তান কোথাকার! ভেবেছ কি?'

'তোরা কেন এসেছিস এখানে?' গর্জে উঠল ডারটি।

রেগে গেল রাফিয়ান, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেঁচাতে শুরু করল।

'তোর বাপের জায়গা···' দাঁড়টা তুলে নিল মুসা, রাগে কথা সরছে না।

কাঁধে হাত দিয়ে তাকে চুপ করতে বলল কিশোর। ডারটির দিকে ফিরল, রাফিয়ানের ভয়ে ধীরে ধীরে নৌকা পিছিয়ে নিচ্ছে ডাকাতটা।

'দেখো,' শান্তকণ্ঠে বলল গোয়েন্দাপ্রধান, 'তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করছ।

হদে অনেক জায়গা, আমাদের কাছে তোমাদের না এলেও চলে। খামোকা এসব করছ কেন?'

'পুলিশের কাছে যাচ্ছি,' রাগে লাল হয়ে গেছে টিকসির মুখ, 'তোমরাও বাড়াবাড়ি কম করছ না। না বলে অন্যের ভেলা নিয়ে এসেছ, অন্যের বাড়িতে জোর করে ঘুমাচ্ছে, আমাদের খাবার চুরি করেছ...'

'আবার সেই এক কথা,' হতাশ ভঙ্গিতে দু-হাত নাড়ল কিশোর। 'তোমরা কি করেছ? নৌকা বলে এনেছ? আমরা খাবার চুরি করেছি না তোমরা আমাদের খাবার চুরি করেছ? একটু আগে কি করলে? ধাক্কা মেরে ভেলা ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে। যাও না পুলিশের কাছে, বলো গিয়ে। আমাদেরও মুখ আছে।'

ফুঁসছে ডারটি। দাঁড় তুলে নিল, ছুঁড়ে মারবে।

'খবরদার,' আঙুল তুলল কিশোর। 'অনেক সহ্য করেছি, আর না। এবার কুকুর লেলিয়ে দেব। তোমাকে ছেঁড়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে রাফি।'

'গররররর!' কিশোরের কথায় সায় দিয়ে একসারি 'চমৎকার' দাঁত ডারটিকে দেখিয়ে দিল রাফিয়ান।

দ্বিধায় পড়ে গেল দুই ডাকাত। নিচু গলায় কিছু আলোচনা করল। তারপর মুখ ফিরিয়ে গলার স্বর নরম করে টিকসি বলল, 'দেখো ছেলেরা, আমরা শান্তিতে ছুটি কাটাতে এসেছি, উইক-এণ্ডে। কিন্তু আমরা যেখানেই যাই দেখি তোমরা আছ, এটা আমাদের ভাল লাগে না। আসলে, আশেপাশে কেউ না থাকুক এটাই চাইছি আমরা। ঠিক আছে, একটা রফা করা যাক। তোমরা চলে যাও, আমরা তাহলে পুলিশকে কিছু বলব না। খাবার যে চুরি করেছ, একথাও না।'

'পুলিশের কাছে যেতে কে মানা করছে? যাও না,' বলল কিশোর। 'রফাটফা কিছু হবে না। আমাদের যখন খুশি তখন যাব।'

জ্বলে উঠল টিকসির চোখ। সামলে নিল। আবার আলোচনা করল ডারটির সঙ্গে। ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ছুটি কদিন তোমাদের? কবে যাচ্ছ?'

'আগামীকাল,' বলল কিশোর।

আবার কিছু আলোচনা করল দুজনে।

আস্তে করে নৌকাটা কয়েক ফুট সরিয়ে নিল ডারটি। উঁকি দিয়ে পানির নিচে তাকাল টিকসি। মুখ তুলে ডারটির দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল।

ছেলেদের সঙ্গে আর একটাও কথা না বলে নৌকা নিয়ে চলে গেল ওরা।

'কি করবে বুঝেছি,' হাসিমুখে বলল কিশোর। 'কাল আমাদের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকবে। তারপর আসবে নিরাপদে লুটের মাল তুলে নেয়ার জন্যে। টিকসি পানির দিকে তাকিয়েছিল, খেয়াল করেছ? নৌকাটা দেখেছে। আমাদের মার্কারও দেখেছে।'

'তাহলে এত খুশি হয়েছ কেন?' জিনা বুঝতে পারছে না। 'নৌকাটা আমরা তুলতে পারছি না। আর আগামীকাল চলে যেতেই হচ্ছে। স্কুল মিস করা চলবে না।'

দূরে চলে গেছে নৌকা, সেদিকে চেয়ে বলল কিশোর, 'কাল যে যাব, এটা ইচ্ছে করেই বলেছি, ওদের সরানোর জন্যে। লুটের মাল তুলে নিতে পারব

আমরা।'

'কিভাবে?' একসঙ্গে বলল অন্য তিনজন। রাফিয়ানও মুখ বাড়াল সামনে, যেন সে-ও জানতে চায়।

'নৌকা তো চাই না আমরা,' কিশোর বলল, 'চাই মালগুলো। তাহলে নৌকাটা তোলার দরকার কি? ডুব দিয়ে গিয়ে ওগুলো তুলে নিয়ে এলেই হলো। মনে হয় কোন বস্তা বা বাক্সের মধ্যে রেখেছে। ভারি না হলে এমনিতেই তোলা যাবে, আর ভারি হলে দড়ি বেঁধে টেনে তুলতে হবে।'

'শুনতে তো ভালই লাগছে, কিন্তু যাচ্ছে কে?' হ্রদের কালো পানির দিকে চেয়ে বলল রবিন। 'আমার ভাই ভয় লাগে।'

'আমি যাব,' মুসা বলল। 'সেদিন থেকেই তো খালি ভেলায় করে ঘুরছি। একবারও সাঁতার কাটতে পারিনি। রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে।'

'ভালমত ভেবে দেখো,' কিশোর সাবধান করল। 'যা ঠাণ্ডা, শেষে না নিউমোনিয়া বাধাও।'

'আরে দূর,' পাত্তাই দিল না মুসা। 'পানিতে বরফ গুলে দিলেও ঠাণ্ডা লাগবে না আমার।'

বিশ্বাস করল সবাই। এই হ্রদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকলেও কিছু হবে না তার।

তিন-চার টানে জামাকাপড় সব খুলে ফেলল মুসা। খালি হাফপ্যান্টটা রাখল পরনে। এতই নিখুঁত ভাবে ডাইভ দিয়ে নেমে গেল, ঢেউ প্রায় উঠলই না। বকের মত গলা বাড়িয়ে ভেলার কিনারে ঝুঁকে এল অন্য তিনজন। দেখছে, হাত-পা নেড়ে নেমে যাচ্ছে একটা আবছা মূর্তি। কালো পানিতে কেমন যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

সময় কাটছে।

'এতক্ষণ থাকে কি করে?' উদ্বিগ্ন হলো রবিন। 'বিপদ-টিপদ...'

'না,' বলল কিশোর। 'ওকে তো চেনই। অনেকক্ষণ দম রাখতে পারে। সেই যে সেবার...'

হুস্‌স্‌ করে ভেলার পাশে ভেসে উঠল মুসার মাথা। জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস টেনে বলল, 'আছে!'

'কি কি দেখলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ভেলার কিনার খামচে ধরে ভেসে রইল মুসা। দম নিয়ে বলল, 'এক ডুবে সোজা গিয়ে নামলাম নৌকায়। ভাঙা, পুরানো। তুলতে গেলে খুলে যাবে জোড়ায়, পচে গেছে। পলিথিনের একটা ব্যাগে রয়েছে মালগুলো। বেজায় ভারি। টানাটানি করেছি, তুলতে পারলাম না।'

'নড়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, নড়েওনি।'

'তাহলে বেঁধে রেখেছে হয়তো। কিংবা অন্য কোনভাবে আটকে রেখেছে। দড়ি বেঁধে দিয়ে আসতে হবে। তারপর সবাই মিলে টেনে তুলব। তবে তার আগে কিসে আটকানো রয়েছে, সেটাও খুলে দিয়ে আসতে হবে।'

পানিতে বিচিত্র শিরশিরানি তুলে বয়ে গেল একঝলক বাতাস। সামান্য কাঁটা

দিয়ে উঠল মুসার গা।

'বাহ্, ব্যায়ামবীরেরও কাঁপুনি ওঠে দেখি,' হেসে বলল জিনা। 'বুঝলাম, তলায় কেমন ঠাণ্ডা। আমিও নামব ভাবছিলাম।'

'তাহলে এসো।'

'কাপড় আনিনি তো···ওঠো। গা মোছো।'

'দাঁড়াও, খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে নিই।'

'না না, উঠে পড়ো,' বাধা দিল কিশোর। 'পরে আরও ডোবাডুবি করতে হবে। বোটহাউস থেকে গিয়ে দড়ি আনতে হবে আগে।' তীরের দিকে তাকাল সে।

নৌকা তীরের কাছে একটা শেকড়ে বেঁধে ওপরে উঠে গেছে দুই ডাকাত। দেখা যাচ্ছে না ওদেরকে। হঠাৎ আলোর ঝিলিক দেখতে পেল কিশোর, রোদে লেগে ঝিক করে উঠেছে কিছু।

আরেকবার দেখা গেল ঝিলিক। রবিনও দেখল এবার। 'কি ব্যাপার?' সপ্রশ্ন চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

'বুঝতে পারছ না? দূরবীণ। ব্যাটারা লুকিয়ে লুকিয়ে চোখ রেখেছে আমাদের ওপর। মুসা যে ডুব দিয়ে এসেছে, তা-ও দেখেছে।'

'তাহলে?' জিনার প্রশ্ন।

'তাহলে আর কি? এখন আর ডুব দেয়া চলবে না।'

'এখন ডুব দিতে যাচ্ছেও না। আগে বোটহাউস থেকে দড়ি আনতে হবে, তারপর···'

'তারপরও হবে না। ওরা আজ সারাদিন নড়বে না ওখান থেকে।'

'তাহলে?' আবার একই প্রশ্ন করল জিনা।

'রাতে চাঁদ থাকবে,' বলল কিশোর।

'ভেরি গুড আইডিয়া,' ভেলায় চাপড় মারল জিনা।

'লুটের মাল নিয়ে চলে যাব আমরা সকালে। তারপর আসবে সাহেবরা, পাবে ঠনঠন।' বুড়ো আঙুল দেখাল সে।

'এখন সরে যাচ্ছি আমরা?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'মোটেই না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমরা চলে গেলে ওরা এসে তুলে নিয়ে যেতে পারে। সারাদিন লেকে থাকব আমরা, ঘুরব-ঘারব। ওদের পাহারা দেব আমরা, আমাদেরকে দেবে ওরা।'

'দুপুরে না খেয়ে থাকব?'

'না। রাফিয়ানকে নিয়ে তুমি আর জিনা থাকবে ভেলায়। আমি আর রবিন গিয়ে নিয়ে আসব খাবার।'

'যদি আবার খাবার চুরি করে?'

'পারবে না। ভাঁড়ারের আলমারির পেছনে আরেকটা ছোট ঘর আছে, দেখেছি। আলমারির ভেতর দিয়ে ঢুকতে হয়। খুব ভালমত না দেখলে বোঝা যায় না কোনদিক দিয়ে কিভাবে ঢুকতে হয়। ওখানে রেখে আসব।'

'তুমি যখন দেখেছ, ওরাও তো দেখে ফেলতে পারে,' রবিন বলল।

'তা পারে, সেটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে। আর কি করার আছে বলো? তবে ওরা

আমাদের চেয়ে বেশি উত্তেজিত, সেটা করতে যাবে বলে মনে হয় না। কাল চলে যাব বলেছি আমরা, খাবার চুরি করে রাগিয়ে দিতে চাইবে না।'

'যদি পিস্তল জোগাড় করে আনে?' জিনার প্রশ্ন।

'তাহলে আর কিছু করার থাকবে না আমাদের। দেখা যাক, কি হয়।'

পনেরো

হেসে খেলে কেটে গেল সারাটা দিন।

পশ্চিম দিগন্তে নেমে যাচ্ছে সূর্য। ডুবে গেল এক সময়। আকাশের লালিমা ঢেকে দিল এক টুকরো কালো মেঘ। শঙ্কা ফুটল জিনার চেহারায়।

'ও কিছু না, সরে যাবে,' আশ্বস্ত করল কিশোর।

ভেলা লুকিয়ে রেখে পাড়ে নামল ওরা। আস্তানায় ফেরার পথে চট করে একবার বোটহাউসে ঢুকে এক বাণ্ডিল দড়ি বের করে আনল মুসা।

ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর, বৃষ্টি এল না। ঘণ্টাখানেক বাদেই পাতলা হয়ে গেল মেঘ, তারা দেখা দিল। পরিষ্কার আকাশ।

সিঁড়িমুখের কাছে রাফিয়ানকে পাহারায় রেখে অন্ধকার ভাঁড়ারে নামল ওরা। গোটা দুই মোম জ্বালল কিশোর।

না, কেউ ঢোকেনি ঘরে।

খাবার বের করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল ওরা।

'শুয়ে পড়ো সবাই,' বলল কিশোর। 'দশটা এগারোটার দিকে বেরোতে হবে।'

'একটা অ্যালার্ম-ক্লক থাকলে ভাল হত,' বলল মুসা। 'রবিন ঠিকই বলেছিল।'

'আমার ঘুম আসবে না,' রবিন বলল। 'ঠিক আছে, জেগে থাকি, সময়মত তুলে দেব তোমাদের।'

'ঘুম না আসুক, শুয়ে থাকো,' বলল কিশোর। 'বিশ্রাম হবে।'

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর আর মুসা। জিনার দেরি হলো।

চিত হয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে রবিন। পাতালকক্ষে বাতাস ঢুকতে পারছে না ঠিকমত, তবু যা আসছে সিঁড়িমুখ দিয়ে, তাতেই কাঁপছে মোমের শিখা, ঘরের দেয়ালে ছায়ার নাচন। সত্যি, তাদের এই অভিযানের তুলনা হয় না। আর সে দেখেছে, যতবারই জিনা সঙ্গে থাকে, অ্যাডভেঞ্চার যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তার মনে পড়ল সেই প্রেতসাধকের কথা, সাগর সৈকতে গুপ্তধন উদ্ধারের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা, মৃত্যুখনির সেই বুক-কাঁপানো মৃত্যুগুহা···আর এবারকার অভিযানটাই বা কম কি? এক কাজ করবে—ভাবল সে, রকি বীচে ফিরেই কিশোরকে পটিয়ে-পাটিয়ে জিনাকেও গোয়েন্দাদের একজন করে নেবার কথা বলবে। জানে, সহজে রাজি হবে না কিশোর। আদৌ রাজি হবে কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে রবিনের, তবু বলে দেখবে। এখন আর অসুবিধে নেই। রকি বীচেই স্কুলে ভরতি হয়েছে জিনা, ইচ্ছে করলে চার গোয়েন্দা করা যায়···

এগোরোটা বাজার দশ মিনিট আগে সবাইকে তুলে দিল রবিন।

সারাদিন পরিশ্রমের পর এত আরামে ঘুমিয়েছিল, উঠতে কষ্ট হলো তিনজনেরই।

তৈরি হয়ে নিল।

বেরিয়ে এল বাইরে।

যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনি শুয়ে আছে রাফিয়ান, কিন্তু সতর্ক। সাড়া পেয়ে উঠে বসল।

আকাশে অনেকখানি উঠে এসেছে চাঁদ। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। সারা আকাশ জুড়ে সাঁতার কাটছে ছোট-বড় মেঘের ভেলা। কখনও চাঁদ ঢেকে দিচ্ছে, আবছা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে বনভূমি, চাঁদ বেরিয়ে এলেই হেসে উঠছে আবার হলুদ আলোয়।

'তাঁবুর কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না,' উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে বলল মুসা।

'না যাক,' কিশোর বলল। 'তবু সাবধানের মার নেই। কোন রকম শব্দ করবে না। এসো যাই।'

গাছপালা আর ঝোপের ছায়ার পাঁচ মিনিট হাঁটল ওরা হ্রদের পাড় ধরে। চাঁদের আলোয় চকচকে বিশাল এক আয়নার মত দেখাচ্ছে হ্রদটাকে। গুনগুন করে গান ধরল মুসা, জিনাও তার সঙ্গে গলা মেলাতে যাচ্ছিল, বেরসিকের মত বাধা দিয়ে বসল কিশোর। 'এই চুপ চুপ, গান গাওয়ার সময় নয় এটা। ব্যাটারা শুনলে...'

ভেলায় চড়ল ওরা।

সবাই উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত। সেটা সংক্রামিত হয়েছে রাফিয়ানের মাঝেও। চঞ্চল। কি করবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না। রাতের এই অভিযান দারুণ লাগছে তার কাছে। আর কিছু করতে না পেরে এক এক করে গাল, হাত, চেটে দিতে লাগল সবার।

এক রত্তি বাতাস নেই। বড় বেশি নীরব। দাঁড়ের মৃদু ছপছপ শব্দও বেশি হয়ে কানে বাজছে। পানির ছোট ছোট ঢেউ আর বুদবুদ উঠে সরে যাচ্ছে ভেলার গা ঘেঁষে, রূপালি খুদে ফানুসের মত ফাটছে বুদবুদগুলো।

'এত সুন্দর রাত খুব কমই দেখেছি,' তীরের নীরব গাছপালার দিকে চেয়ে আছে রবিন। 'এত শান্তি। এত নীরব।'

তাকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই যেন কর্কশ চিৎকার করে উঠল একটা পেঁচা। চমকে গেল রবিন।

'যাও, গেল তোমার নীরবতা,' হাসতে হাসতে বলল মুসা।

'রবিন ঠিকই বলেছে,' কিশোর বলল, 'এত সুন্দর রাত আমিও কম দেখেছি। ইয়ার্ডে কাজ না থাকলে, এমনি জ্যোৎস্না রাতে ছাতে উঠে বসে থাকে রাশেদচাচা, অনেকদিন দেখেছি। আকাশের দিকে, চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবে। জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন। বিশ্বাস করবে? কেঁদে ফেলেছিল চাচা, দেশের কথা, তার ছেলেবেলার কথা বলতে বলতে। বাংলাদেশে নাকি এর চেয়েও সুন্দর চাঁদ ওঠে। ফসল কাটা শেষ হলে ধু-ধু করে নাকি ফসলের মাঠ, ধবধবে সাদা। শিশির ঝরে। চাঁদনি রাতে শেয়ালের মেলা বসে সেই মাঠে, বৈঠক বসে, চাচা নাকি দেখেছে। চাচা প্রায়ই বলে, কোনমতে ইয়ার্ডের ভারটা আমার কাঁধে গছাতে পারলেই চাচীকে নিয়ে দেশে চলে যাবে...'

'আরে, এই রাফি, আমার কান খেয়ে ফেলবি নাবি?' বেরসিকের মত মুসার গান তখন থামিয়ে দিয়েছিল কিশোর, সেই শোধটা নিল যেন এখন।

'ওই যে, বাক্সটা না?' হাত তুলে বলল জিনা।

হ্যাঁ, বাক্সটাই মারকার। চাঁদের আলো চিকচিক করছে ওটার ভেজা পিঠে।

কাছে এসে ভেলা থামাল।

কাপড় খুলতে শুরু করল মুসা। জিনা সাঁতারের পোশাক পরে এসেছে।

রিঙের মত করে পেঁচানো দড়ির বাণ্ডিলের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল মুসা। ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে। জিনা নামল তার পর পরই।

দম কেউ কারও চেয়ে কম রাখতে পারে না।

প্রথমে ভাসল জিনার মাথা।

তার কিছুক্ষণ পর মুসার। দম নিয়ে বলল, 'বাঁধন কেটে দিয়েছি পোঁটলাটার। আবার যেতে হবে, দড়ি বাঁধব।'

জিনাকে নিয়ে আবার ডুব দিল মুসা।

দুজনে মিলে শক্ত করে ব্যাগের মুখে পেঁচিয়ে বাঁধল দড়ি। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেখল মুসা, খোলে কিনা। খুলল না। ওপর থেকে টেনে তোলা যাবে, বাঁধন খুলে পড়ে যাবে না ব্যাগে।

দড়ির আরেক মাথা হাতে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল মুসা। পাশে জিনা।

'হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর

হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা ঝাঁকাল দুজনে।

দম নিয়ে ভেলায় উঠে এল জিনা আর মুসা।

'তোয়ালেটা কোথায়?' কাঁপতে কাঁপতে বলল জিনা। 'ইস্, পানি তো না, বরফ।'

তাদের দিকে নজর নেই এখন রবিন আর কিশোরের। দড়ি ধরে টেনে ব্যাগটা তুলতে শুরু করেছে। ভারের জন্যে একপাশে কাত হয়ে গেছে ভেলা। আরেকটু টান পড়লেই পানি উঠবে।

উল্টোধারে সরে গেল জিনা আর মুসা, রাফিয়ানকেও টেনে সরাল নিজেদের দিকে। সোজা হলো আবার ভেলা।

তীরের দিকে চেয়ে হঠাৎ ঘাউ ঘাউ করে উঠল রাফিয়ান।

তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ধমক দিল জিনা, 'চুপ! চুপ!' শঙ্কিত চোখে তাকাল কুকুরটা যেদিকে চেয়ে আছে সেদিকে। 'টিকসিরা আসছে না তো?'

কাউকে দেখা গেল না। বোধহয় শেয়াল-টেয়াল দেখেছে রাফিয়ান।

ব্যাগটা তুলে আনা হয়েছে।

আর এখানে থাকার কোন মানে নেই। তীরের দিকে রওনা হলো ওরা।

ভালয় ভালয় আস্তানায় ফিরে যেতে পারলেই বাঁচে এখন।

ভেলা আগের মতই লুকিয়ে রাখা হলো। বোটহাউসে রাখলে আর ডারটি দেখে ফেললে সন্দেহ করবে। কি ঘটেছে বুঝেও যেতে পারে।

খাড়া পাড়, শেকড় বেয়ে উঠতেই কষ্ট হয়। ভারি একটা বোঝা নিয়ে ওঠা যাবে না। ব্যাগটা নিচে রেখে, দড়িটা দাঁতে কামড়ে ধরে আগে উঠে গেল মুসা।

তার পেছনে রবিন আর জিনা। কিশোর নিচে রয়েছে। দড়ি ধরে ব্যাগটা টেনে তুলতে বলল ওদেরকে।

ব্যাগটা উঠে যেতেই সে-ও উঠে এল ওপরে।

চুপ করে আছে রাফিয়ান। তারমানে ঝোপের ভেতর ঘাপটি মেরে নেই কেউ, আচমকা ঘাড়ে এসে লাফিয়ে পড়বে না।

গাছের ছায়ায় ছায়ায় আস্তানায় ফিরে এল ওরা। রাফিয়ানকে সিঁড়িমুখের কাছে পাহারায় বসিয়ে অন্যেরা নেমে এল ভাঁড়ারে।

মোম জ্বালল কিশোর।

'আগে কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল মুসা।

'ভালই হয়,' জিনাও রাজি।

স্যাণ্ডউইচ বের করে খেতে শুরু করল তিনজনে, কিশোর বাদে। সে ব্যাগ খোলায় ব্যস্ত।

'যা বাঁধা বেঁধেছ,' ভেজা গিঁট কিছুতেই খুলতে পারল না গোয়েন্দাপ্রধান, 'কাটতে হবে।' ছুরি বের করল সে।

বাঁধন কাটার পরেও ব্যাগের মুখ দিয়ে ভেতরের বাক্সমত জিনিসটা বের করা গেল না। দীর্ঘ পানিতে থেকে থেকে বাক্সের গায়ে আঠা হয়ে লেগে গেছে প্লাসটিকের চাদর। কেটে, ছিঁড়ে তারপর বের করতে হবে।

'দাও তো, আমাকেও একটা দাও,' হাত বাড়াল কিশোর।

একটা স্যাণ্ডউইচ দিল জিনা।

খেয়ে নিয়ে আবার চাদর কাটায় মন দিল কিশোর। ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই।

স্টীলের একটা ট্রাংক বেরোল, ফাঁকগুলো রবারের লাইনিং দিয়ে এমন ভাবে বন্ধ, পানি ঢোকার পথ নেই।

তালা লাগানো নেই, নইলে আরেক ফ্যাকড়া বাধত।

ডালা তুলতে শুরু করল কিশোর। দুরুদুরু করছে সবার বুক। ঝুঁকে এসেছে ট্রাংকের চারপাশ থেকে।

ডালা তোলা হলো। ভেতরে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্লাসটিকের অসংখ্য ছোট বাক্স। সব এক সাইজের।

'গহনার বাক্স!' হাত বাড়িয়ে একটা বাক্স তুলে নিল জিনা। ঢাকনা খুলে স্থির হয়ে গেল।

সবার চোখেই বিস্ময়।

কালো মখমলের শয্যায় শুয়ে আছে একটা অপূর্ব সুন্দর নেকলেস। মোমের আলোয় জ্বলছে যেন পাথরগুলো। নিশ্চয় কোন রানী-মহারানীর।

'এটার ছবি দেখেছি আমি,' বিড়বিড় করল জিনা। 'ফেলোনিয়ার রানীর গলায়। তিনি পরে তাঁর এক ভাস্তিকে জন্মদিনে প্রেজেন্ট করে দেন। ভাস্তির বর হলিউডের নামকরা অভিনেতা, বিরাট বড়লোক।'

'হীরা, না?' মুসা বলল। 'দাম কত হবে? একশো পাউণ্ড?'

'মাঝে মাঝে এত বোকার মত কথা বলো না তুমি। একশো হাজার পাউণ্ডেও

দেবে না।'

'থাকগে তাহলে, আমার ওসব কোনদিনই লাগবে না,' হাত নাড়ল মুসা।

'তুমি হার দিয়ে কি করবে? ব্যাটাচ্ছেলে হার পরে?' জিনা বলল।

'কে বলল পরে না? হিপ্পি মার্কা গায়কগুলোর গলায় তো প্রায়ই দেখি।'

আরও কয়েকটা বাক্স খুলে দেখল ওরা। প্রতিটা গহনা দামী। হীরা-পান্না-চুনি-মুক্তা, সবই রয়েছে। হার, কানের দুল, চুরি, আঙটি, প্রায় সব ধরনের অলঙ্কার আছে। রাজার সম্পদ।

'একসঙ্গে এত গহনা কোন মিউজিয়ামেও দেখিনি,' বলল রবিন।

'যাক, ভালই হলো,' ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল কিশোর, 'চোরের হাতে পড়ল না। ভাগ্যিস আমরা এসে পড়েছিলাম। নইলে পুলিশ জানতই না, অখ্যাত এক হ্রদের তলায় লুকানো ছিল এগুলো।'

'নেব কি করে?' মুসার প্রশ্ন।

'সেটাই ভাবছি। ট্রাংক নিয়ে ডারটি আর টিকসির সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না। এক কাজ করো, যার যার ব্যাগে ভরে ফেল, যতটা পারা যায়। বাকিগুলোর বাক্স ফেলে দিয়ে রুমালে পোঁটলা বাঁধব।'

ভাগাভাগি করে ব্যাগে ভরার পরও অনেক জিনিস রয়ে গেল। বাক্স থেকে খুলে ওগুলো রুমালে বাঁধতে হলো, তাতেও লাগল চারটে রুমাল। চারজনের কাছ থাকবে চারটে, ঠিক হলো।

'সকালে উঠে প্রথমে কোথায় যাব?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'পুলিশ?'

'এখানকার পুলিশের যা সুরত দেখে এলাম,' মুখ বাঁকাল কিশোর। 'হবে না। পোস্ট অফিস থেকে মিস্টার নরিসকে ফোন করব। তিনি কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন। তাঁকে বিশ্বাস করা যায়।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে,' বড় করে হাই তুলল মুসা, মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে আঙুলগুলো কলার মোচার মত বানিয়ে নাড়ল বিচিত্র ভঙ্গিতে, ঢুকিয়ে দেবে যেন মুখের ভেতর।

শুয়ে পড়ল সবাই। কিন্তু ঘুম কি আর আসে? বিপদ কাটেনি এখনও।

ষোলো

রাফিয়ানের চেঁচামেচিতে সকালে ঘুম ভাঙল ওদের। সিঁড়িমুখ দিয়ে রোদ ঢুকছে।

লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। অন্যদের ঘুমও ভেঙে গেছে।

কি হয়েছে দেখার জন্যে ওপরে উঠে এল গোয়েন্দাপ্রধান।

টিকসি দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে ভাব জমাতে চাইল, 'তোমাদের কুকুরটা কিন্তু খুব ভাল। ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয় না কাউকে।'

'ধন্যবাদ,' নিরস গলায় বলল কিশোর।

'দেখতে এলাম, খাবার-টাবার কিছু আছে কিনা,' হাসল টিকসি। 'লাগবে কিছু?'

'হঠাৎ দরদ এমন উথলে উঠল কেন?' কেন, সেটা খুব ভালমতই বুঝতে পারছে

কিশোর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে চায় দুই ডাকাত।

'খাবার তাহলে লাগবে?' কিশোরের তীব্র খোঁচাটা কোনমতে হজম করল টিকসি। তাছাড়া তাকে ভয়ও পেতে আরম্ভ করেছে। বড় বেশি ধার ছেলেটার জিভে। চাঁচাছোলা কথা। কাউকে পরোয়া করে বলে না।

'নো, থ্যাংকস,' আবার বলল কিশোর। 'অনেক খাবার বেঁচে গেছে। কারও লাগলে বরং দিতে পারি।'

'ও···তা···তা,' আমতা আমতা করছে টিকসি। কি বলতে গিয়ে আবার কি জবাব শুনতে হবে কে জানে! 'যাচ্ছ কখন?'

'যাব। আজ স্কুলে হাজিরা দিতেই হবে।'

'তাড়াতাড়ি করো তাহলে। বৃষ্টি আসবে।'

আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। 'কই, মেঘের নামগন্ধও তো দেখছি না।'

অন্যদিকে চোখ ফেরাল টিকসি।

মুচকি হেসে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। টিকসি যেমন চাইছে ওরা চলে যাক, কিশোরও চাইছে সে চলে যাক। মহিলা দাঁড়িয়ে থাকলে ওদেরও বেরোতে অসুবিধে।

দশ মিনিটেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল চারজনে।

টিকসি চলে যাচ্ছে, ঝোপের ওপর দিয়ে মাথা দেখা যাচ্ছে তার। ফিরে তাকাল একবার, এক মুহূর্ত থেমে দেখল, তারপর ঘুরে আবার হাঁটতে লাগল।

'জলার ধার দিয়ে যেতে ভালই লাগবে,' রবিন বলল।

'সেদিন আসার সময় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, ভালমত দেখতে পারিনি। আজ দেখব।'

কথা বলতে বলতে চলেছে ওরা। জোরে পা চালাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পোড়া বাড়ির কাছ থেকে সরে যাওয়া যায়, ভাল।

সময়ের হিসেব রাখছে না ওরা, দরকার মনে করছে না। মুসার একটা কথায় হেসে উঠল সবাই। এই সময় হঠাৎ পেছনে চেয়ে গলা ফাটিয়ে ঘেউঘেউ জুড়ে দিল রাফিয়ান।

ফিরে তাকাল সবাই। চমকে উঠল। দৌড়ে আসছে দুই ডাকাত।

'আরে, জলা ভেঙেই আসছে। গাধা নাকি?' রবিন বলল

'শর্ট-কাট,' কিশোর বলল। 'চোরাকাদায় পড়লে ঠেলা বুঝবে। মরুকগে ব্যাটারা। হাঁটো। পথ ধরে। আমরা জলায় নামছি না।'

চলার গতি বাড়িয়ে দিল ওরা।

'পাগল হয়ে গেছে,' ফিরে চেয়ে বলল জিনা।

'হবারই কথা,' কিশোর বলল। 'এভাবে নাকের ডগা দিয়ে লাখ লাখ ডলার চলে যাচ্ছে। নৌকায় মাল না পেয়ে নিশ্চয় আমাদের ভাঁড়ারে ঢুকেছিল। ট্রাংক আর বাক্সগুলো ওভাবে রেখে আসা উচিত হয়নি। জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এলে হত।'

'আসুক না, কি হবে?' মুসা বলল। 'রাফি আছে। তাছাড়া আমরা চারজন। দুজনের সঙ্গে পারব না? পিস্তল নেই ওদের কাছে।'

'তা-ও কথা ঠিক। দেখি কি হয়।'

ছপছপ করে কাদাপানি ভেঙে আসছে ডারটি। তার পেছনে টিকসি। কোথায় পা ফেলছে, খেয়ালই করছে না।

অনেক কাছে এসে পড়ল দুজনে।

গোয়েন্দাদের সঙ্গে বোঝা, দৌড়ানোর উপায় নেই। হাঁপিয়ে পড়ল।

'এভাবে হবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ধরে ফেলবে। তার চেয়ে দাঁড়াই। দেখা যাক কি করে।'

ফিরে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করল রাফিয়ান। ভয়ানক হয়ে উঠেছে চেহারা। কিন্তু কেয়ার করছে না ডারটি। বাঘা কুকুরের সঙ্গে লাগতেও যেন আপত্তি নেই আর এখন। যে করেই হোক, গহনাগুলো তার চাই।

আর বেশি বাকি নেই, ধরে ফেলবে ছেলেদের, এই সময় বিপদে পড়ল ডারটি। আঠাল কাদায় আধ হাত ডুবে গেল পা। কোনমতে টেনে তুলে আরেক জায়গায় ফেলল, ভাবল ওখানটায়ও নরম কাদা। কিন্তু তলায় পাথর বা শক্ত অন্য কিছু রয়েছে, যেটাতে জোরে পা পড়ায় বেকায়দা রকম কাত হয়ে গেল পা, গোড়ালি গেল মচকে। চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবারে, গেছি! আমার পা গেল! উফ্!' আধহাত কাদার মধ্যেই বসে পড়ল সে।

তাকে তোলার জন্যে লাফিয়ে এগিয়ে আসতে গিয়ে টিকসিরও দুই পা দেবে গেল কাদায়, একবারে হাঁটু পর্যন্ত। টেনে তোলার জন্যে জোরাজুড়ি করতেই আরও ডুবে গেল পা। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে, ভাবল চোরা কাদায় ডুবে যাচ্ছে।

ভালমত আটকেছে দুজন। এমন এক জায়গায়, কেউ গিয়ে সাহায্য না করলে বেরিয়েই আসতে পারবে না। সাহায্যের জন্যে অনুনয় শুরু করল।

মায়া হলো রবিনের। 'যাব নাকি?'

'পাগল হয়েছ,' বলল মুসা।

'থাক,' কিশোর বলল, 'শিক্ষা হোক কিছুটা। আমরা গিয়ে লোক পাঠিয়ে দেব। চোরাকাদায় পড়েনি, মরবে না। তুলতে গিয়ে আমরাই শেষে পড়ব বিপদে।'

ওদেরকে দেখে খুশি হলো পোস্টম্যান। 'কেমন কেটেছে, অ্যাঁ? টু-ট্রীজে?'

'খুব ভাল,' বলে অন্যদের রেখে টেলিফোনের দিকে এগোল কিশোর।

বাড়িতেই পাওয়া গেল মিস্টার নরিসকে। শুনে তো প্রথমে চমকে উঠলেন। বললেন, 'তোমরা ওখানেই থাকো। আমি আসছি।'

ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেলেন নরিস। ছেলেদের গাড়িতে তুলে নিলেন। গ্রামরক্ষীর কাছে গিয়ে কিছুই হবে না, সোজা চললেন শেরিফের কাছে। জেলখানাটার কাছেই শেরিফের অফিস।

শেরিফ লোক ভাল, বুদ্ধিমান। সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, লিকলিকে শরীর। সব শুনে শিস দিয়ে উঠলেন। পোঁটলা খুলে প্রথমেই তুলে নিলেন ফেলোনিয়া নেকলেসটা।

'এটা যে কত খোঁজা খুঁজেছে পুলিশ,' বললেন তিনি। বেল বাজিয়ে সহকারীকে ডেকে সংক্ষেপে সব জানিয়ে বললেন 'হ্যারি, তিনজন লোক নিয়ে যাও। ডাকাতদুটোকে তুলে আনোগে।'

অবাক হয়ে শুনল হ্যারি। ছেলেদের দিকে চেয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকাল। হেসে

বলল, 'তোমরা বাহাদুর। যাই, নিয়ে আসিগে পাজিগুলোকে।'

গহনাগুলো শেরিফের দায়িত্বে দিয়ে দিল ছেলেরা। তবে প্রতিটি জিনিসের একটা লিস্ট করে তাতে 'রিসিভড' লিখিয়ে শেরিফের স্বাক্ষর নিয়ে নিল। সাক্ষী রইলেন মিস্টার নরিস। কাগজটা ভাঁজ করে সযত্নে পকেটে রেখে দিল কিশোর।

'পাখোয়াজ ছেলে,' তারিফ করলেন শেরিফ। 'বড় হয়ে কি হওয়ার ইচ্ছে?'

'হয়তো গোয়েন্দাই থেকে যাব,' বলল কিশোর। 'জানি না এখনও।'

শেরিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোল ওরা। খামারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক চাপাচাপি করলেন মিস্টার নরিস, কিন্তু রাজি হলো না ছেলেরা। স্কুল কামাই করবে না।

শেষে তাদেরকে বাস স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন মিস্টার নরিস।

বিদায় নেয়ার আগে একে একে সবাই হাত মেলাল তাঁর সঙ্গে। গম্ভীর মুখে রাফিয়ানও একটা পা বাড়িয়ে দিল।

হেসে উঠলেন মিস্টার নরিস। 'তুই একটা কুকুর বটে, রাফি। তোর মত একটা কুকুর যদি আমার থাকত।'

গোঁ গোঁ করে কুকুরে-ভাষায় কিছু বলল রাফিয়ান, বোধহয় বলেছে, 'ঠিক আছে, যান। জিনা তাড়িয়ে দিলেই চলে আসব আপনার কাছে।'

তার কথা যেন বুঝতে পারল জিনা, তাড়াতাড়ি গলার বেল্ট ধরে রাফিয়ানকে কাছে সরিয়ে নিল।

হাসল সবাই।

আবার এদিকে কখনও বেড়াতে এলে যেন তাঁর বাড়িতে ওঠে, বার বার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন মিস্টার নরিস।

বাস আসতে বোধহয় দেরি আছে।

মুসা বলল, 'কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল,' বলল কিশোর। 'আমিও একথাই ভাবছিলাম।' খাবারের দোকানটা দেখিয়ে বলল, 'চলো, ডিকের মায়ের সঙ্গেও দেখা হবে। বলেছিলেন ফেরার পথে দেখা করে যেতে।'

ছেলেদের দেখে খুব খুশি হলেন বৃদ্ধা। তবে আগের বারের মতই রাফিয়ানকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন না, দরজার বাইরে রাখলেন। আদর-অভ্যর্থনার পর টুকটাক আরও কিছু কথা, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কটা স্যাণ্ডউইচ লাগবে?'

'আজ বেশি লাগবে না, বাড়ি ফিরছি তো,' বলল কিশোর। 'তাছাড়া পথে খিদে পেলে খাবার পাওয়া যাবে।' হিসেব করে বলল, 'চার-পাঁচে বিশটা।'

'ঠিক আছে,' ঘুরে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন বৃদ্ধা। দরজার কাছে গিয়ে ফিরলেন। 'হ্যাঁ, কেউ এলে ডেকো।'

চলে গেলেন দরজার ওপাশে।

****